রায়-চৌধুরী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২



প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৫৩
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
প্রচ্ছদপট-শিল্পী—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রাকর—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস,
৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—
বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।

দুই টাকা চারি আনা

অনেক চেষ্টা ক'রে চৌধুরীদের ছেলে বিজয় একটা ময়না পাখী ধ'রেছে। বারো-তেরো বছরের ছেলের পক্ষে এটা বড় কম বাহাদুরীর কথা নয়। পাখীটাকে ভালো ক'রে দুহাতে চেপে ধ'রে মনের আনন্দে সে বাড়ী ফিরছিল। এমন সময়ে হঠাৎ তাকে পিছু ডাকলো রায়েদের মেয়ে বিমলা : বিজয়দা! বিজয়দা!—পাখীটা আমাকে দাও না বিজয়দা!

বিমলার আব্দার দেখে অবাক হ'য়ে যায় বিজয়। রায় আর চৌধুরীতে ভীষণ ঝগড়া, এ-বাড়ীর সঙ্গে ও-বাড়ীর কথাবার্ত্তা বন্ধ। এমন অবস্থায় বিমলার বাবা যদি জানতে পারে যে বিমলা বিজয়ের সঙ্গে কথা ব'লেছে তাহ'লে বিমলাকে যে সে মেরে খুন ক'রে ফেল্‌বে সে আক্কেলও কি হয় নি মেয়েটার? তা'ছাড়া বিজয়ের এত সাধের পাখী, 'দাও' ব'ললেই অমনি দেওয়া যায়! বিজয় মুখ ঘুরিয়ে বলে—বা-রে! এত কষ্ট ক'রে ধরলুম, তোকে দেব কেন?

বিমলা বলে—আমি পুষবো।

বিজন বলে—না, আমি পুষবো। দেখবি কি রকম কথা ব'লবে।

বিশ্বাস হয় না বিমলার।—বলে—হ্যাঁ—ওই পাখী আবার কথা ব'লবে!

বিজয় বলে—দেখবি কথা বলে কিনা! কী ব'লবে জানিস্? বলবে—'অশ্বিনী রায়—খালি ঘাস খায়।'

বিমলা ভয় দেখায় : বাবাকে ব'লে দেবো।

বিজয়ের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। বলে—বললি তো বয়ে গেল। বল্ তো ময়না, বল্, 'রায়েদের বিমলা, খায় কাঁচকলা'।

বিমলা বলে—আমিও বলবো—চৌধুরীদের বিজয়—খায়···ব্যস্, ঐ পর্য্যন্ত। মিলিয়ে মিলিয়ে ব'লতেই পারে না বিমলা। শেষ অবধি ঠোঁট

ফুলিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বলে—না দিলে তো না-দিলে! ভারী তো একটা পাখী! আমি চ'ল্লুম।

বিমলা সত্যিই রাগ ক'রে চলে যাচ্ছে দেখে বিজয় ডাকলে: বিমলা! বিম্‌লি! বিমলা ফিরে আসতেই কী ভেবে বিজয় পাখীটা তুলে দিলে তার হাতে। বললে—নে, তোকে দিয়ে দিলাম।

ব্যস্ত হ'য়ে যেই বিমলা হাত বাড়িয়ে পাখীটা নিতে গেছে, অমনি বিমলার হাত ফ'স্‌কে পাখীটা ঝট্‌পট্‌ ক'রে উড়ে পালালো।

কাণ্ডটা দেখে গা জ্ব'লে গেল বিজয়ের। রাগে দুঃখে ঠাস্‌ ক'রে সে এক চড় বসিয়ে দিলে বিমলার গালে। ধমক দিয়ে বললে—হতভাগা মেয়ে! বেরো! দূর হ'।

একে পাখী-হারানোর দুঃখ, তার ওপর বিজয়দার চড় ও বকুনী! বিমলা আর চুপ করে থাকতে পারলে না। ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল নিজেদের বাড়ীতে।

বিজয়া-দশমীর দিন। এমন পুণ্যদিনে পরম শত্রুর সঙ্গেও ঝগড়া-মারামারি ক'রতে নেই। একথা অশ্বিনীরায়ের মত একরোখা লোকও জানে এবং মানে।

চণ্ডীমণ্ডপ থেকে উঠোনে প্রতিমা নামাতে গিয়ে মুখ্যু লোকগুলো নিজেদের মধ্যেই হাতাহাতি লাগিয়েছে। অশ্বিনী রায় এগিয়ে এলো। বললে: আঃ, বিজয়া দশমীর দিনে এসব হ'চ্ছে কী! মারামারি করিস্‌নে, মারামারি করিস্‌ নে, কাজ কর্‌।

এমন সময়ে বিমলা এলো সেখানে কাঁদতে কাঁদতে। মেয়েকে কাঁদতে দেখে বিরক্ত হ'য়ে অশ্বিনী জিজ্ঞেস করলে—আরে, তুই আবার কাঁদতে কাঁদতে কোত্থেকে এলি?

বিমলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে—বিজয়দা' মারলে।

—বিজয়দা মানে? ভবানী চৌধুরীর সেই ছেলেটা?

—হ্যাঁ।

—আজ বিজয়া-দশমীর দিনে মারলে তোকে?

—হ্যাঁ।

কপালের শিরাগুলো কুঁচকে উঠলো অশ্বিনীর। দাঁতে দাঁত চেপে সে বললে—হুঁ! অচ্ছা যা বাড়ীর ভেতর যা। আজ কাঁদতে নেই।

বিমলা চ'লে গেল।

অশ্বিনী দেখলে, বড় রায় ওদিকে ইজিচেয়ারে শুয়ে গড়গুড়া টানছেন আর কার্ত্তিক তার পা টিপতে টিপতে আহ্লাদে আটখানা হয়ে কিসের যেন গল্প করছে।

কাণ-খাড়া করে শুনলে অশ্বিনী, গল্প হ'চ্ছে চৌধুরীদেরই দুর্গা-প্রতিমার সম্বন্ধে। প্রতাপ রায় জিজ্ঞেস করছেন—কেমন প্রতিমা? ভালো?

কার্ত্তিক একেবারে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো: ভালো ব'লে ভালো! আর তাছাড়া লম্বা—বড়ো।

'বড়ো' ব'লেই প্রতাপরায়ের মুখের দিয়ে কার্ত্তিক চেয়ে দেখলে—কথাটা বিশেষ ভালো লাগছে না তাঁর। চৌধুরীদের প্রশংসা রায়েদের কাণে ভালো লাগবার কথাও নয়। তাড়াতাড়ি কথটা সে সামলে নিয়ে বললে: বড়ো তবে বেশি বড়ো নয়, আধ হাতখানেক্ বড়ো হবে আপনাদের চেয়ে।

মুখে হাসি টেনে প্রতাপ রায় বললেন, বেশ বেশ, তবে বেশি বড়ো হওয়া ভালো নয়, প'ড়ে যাবার ভয় থাকে।

কথাটা শেষ হ'তেই এদিক থেকে অশ্বিনী ডাকলে—কার্ত্তিক!

অশ্বিনী রায়ের গুরুগম্ভীর ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে এলো কার্ত্তিক কাছে আসতে অশ্বিনী জিজ্ঞেস ক'রলে—কী বলছিলি বাবাকে?

আম্‌তা আম্‌তা ক'রে কার্ত্তিক বললে, আপনাকেই খুঁজছিলাম। বলি নি তো কিছু, তবে এই দেখে এলাম কিনা!

—কী দেখে এলি ?

—চৌধুরীদের পিতিমে, দুগ্‌গো পিতিমে! তা'—আপনাদের চেয়ে প্রায় আধহাতখানেক বড়ো হবে।

—তা সেকথা বাবাকে বলতে গেলি কেন? বুড়ো হলে গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়, তা জানিস ?

কথার ওপর রঙ চড়িয়ে কথা বলা কার্ত্তিকের চিরদিনের অভ্যেস। সে ব'ললে, তা আর জানিনা? আর তা'ছাড়া বুড়ো হ'লে হাত-পাও থর থর ক'রে কাঁপে।

রং তামাশা শুনবার মতো মনের অবস্থা তখন অশ্বিনীর নয়। মনে মনে সে তখন অন্য মতলব আঁটছিল। কার্ত্তিককে সে জিজ্ঞেস করলে—প্রতিমা তো ওরা এইদিক দিয়েই নিয়ে যায় বরাবর, এ-বছরও যাবে তো ?

কার্ত্তিক ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝে না। সে বললে—বাঃ, যেদিক দিয়ে প্রতি-বছর যায় সেইদিক দিয়েই তো যেতে হবে। আপনাদের এই সদর দিয়েই তো নিয়ে যাবে।

আর কিছু শুনবার বা জানবার দরকার করে না অশ্বিনীর। হিন্দুস্থানী দরোয়ান গিরিধারী আর কিষণ সিংকে সঙ্গে নিয়ে গট্‌-গট ক'রে সে বাইরে বেরিয়ে যায়।

মশাল জ্ব'লছে, ঢাক বাজছে, বাজনার তালে তালে 'রাইবেশে'-নাচ হ'চ্ছে—পালোয়ানদের লাঠিখেলা হ'চ্ছে। খুব ঘটা ক'রে প্রতিমা আসছে চৌধুরীদের। প্রতিমার পেছনে আসছেন—ভবানী চৌধুরী, তাঁর ছেলে বিজয়, আর নায়েব বনমালী। সঙ্গে আছে একজন গুর্খা চাপরাশী—গণেশ বাহাদুর আর একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী সুবল।

হঠাৎ একটা হৈ-হৈ রব উঠলো। থ'মকে দাঁড়ালো সব লোকজন। নায়েব বনমালী সামনে এসে দেখে, এগিয়ে যাবার পথ নেই আর। রাস্তা জুড়ে দেবদারু পাতা আর শালের খুঁটী দিয়ে একটা ফটক তৈরী হ'য়েছে। প্রতিমার চালি আটকে গেছে সেই ফটকে। না কাটলে পেরুবার উপায় নেই।

বনমালী হুকুম দিলে : গণেশ বাহাদুর গেট্ কাটো!

হুকুম পেয়ে গণেশ যেই তার ভোজালি দিয়ে এক কোপ বসিয়েছে খুঁটীর গায়ে, অমনি কাছারী-বাড়ীর দোতলা থেকে গর্জ্জন ক'রে উঠলো অশ্বিনী রায় : খবরদার! আর একটি কোপ মেরেছ কি এই বন্দুক দিয়ে মাথাটি দেবো উড়িয়ে!

অশ্বিনীর হাতে দু'নলা বন্দুক দেখে কারুর আর বুঝতে বাকী রইল না যে ব্যাপারটা অশ্বিনী রায়েরই কীর্ত্তি। নিজের বাড়ীর সামনে সদর-রাস্তায় ফটক তৈরী ক'রে গায়ে-পড়ে সে একটা ঝগড়া বাধাতে চায়।

বনমালী জিজ্ঞেস করলে, এ আবার কী ক'রেছেন এবছর? চৌধুরীদের প্রতিমা প্রতিবছর এইদিক দিয়েই যায়, কই গেট তো থাকে না!

অশ্বিনী জবাব দিলে, আমার বাড়ীর সামনে আমি যা খুশী তাই করবো। তোমার কী?

ভবানী চৌধুরী নিজে এগিয়ে এসে বললেন এ কী ব'ল্ছো অশ্বিনী, গেট না কাটলে প্রতিমা পেরুবে কেমন ক'রে?

অশ্বিনী বললে—রায়েদের বাড়ীর দরজা দিয়ে চৌধুরীরা মাথা হেঁট ক'রে পেরুবে—হামাগুড়ি দিয়ে পেরুবে; বুকে হেঁটে পেরুবে।

ভবানী চৌধুরী দেখলেন, অশ্বিনীর মতলব ভালো নয়। ঝগড়া করবার এক নতুন ফিকির সে বে'র ক'রেছে। ওর সঙ্গে কথা কাটাকাটি ক'রে কোন ফল হবে না। তার চেয়ে সমস্ত বিষয়টা একবার অশ্বিনীর বাবা প্রতাপ রায়কে জানানো দরকার।

ডাকাডাকি করতেই বৃদ্ধ প্রতাপ রায় বেরিয়ে এলেন। ছেলের কাণ্ড দেখে অনেক চেষ্টা করলেন তিনি ছেলেকে নিরস্ত ক'রতে। কিন্তু অশ্বিনী কারও কথা শুনবার পাত্র নয়। সে বললে, তুমি কিছু জানো না বাবা, তুমি ভেতরে যাও। আজ ঐ চৌধুরীর ছেলেটা তোমার নাতনী বিমলাকে মেরেছে, আর তা'ছাড়া আমাদের চেয়ে বড়ো প্রতিমা ক'রে ওরা আমাদের ওপর টেক্কা দিতে চায়। বা'র করছি আমি ওদের টেক্কা দেয়া!

বনমালীর ইসারায় গণেশ-বাহাদুর আবার খুঁটীতে কোপ বসাতে সুরু করেছিল।

ভবানী চৌধুরী বললেন, থাক আজ বিজয়ার দিনে রক্তারক্তি হাঙ্গামায় কাজ নেই। প্রতিমা ফেরাও।

এত সহজে ছেড়ে দেওয়াটা মনঃপূত হলো না বনমালীর। সে বললে, না না তা হয় না। প্রতিমা প্রতিবছর যেদিক দিয়ে যায় এবছরও সেই পথ দিয়েই যাবে।

অশ্বিনী ধমক দিলে! তোমার কথাতেই যাবে? কই যাক্ দেখি।

বনমালীও রুখে দাঁড়ালো, যায় কিনা এই ছাখো।—নিজেই সে ভোজালিটা কেড়ে নেয় গণেশের হাত থেকে, ঝপাঝপ কোপ মারতে আরম্ভ করে শালখুঁটীর গায়ে।

অশ্বিনী বন্দুক উঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠল: বনমালী!

ভবানী চৌধুরী এসে আড়াল ক'রে দাঁড়ালেন বনমালীকে। হাত বাড়িয়ে বনমালীকে আড়াল করে দিয়ে বললেন! বন্দুক চালাতে চাও তো আমার বুকেই চালাও অশ্বিনী।

'বাবা, বাবা' ব'লে চীৎকার করতে করতে ছুটে এলো বিজয়। প্রতাপ রায় দেখলেন একী সর্ব্বনাশ! অশ্বিনী হয়তো ভবানী চৌধুরীর বুকেই গুলি চালাতে পিছপা' হবে না। তাড়াতাড়ি তিনি অশ্বিনীর হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করলেন। হাতাহাতি করতে গিয়ে বন্দুক থেকে প্রচণ্ড

শব্দে গুলী ছুটে গেল। বন্দুকের আওয়াজ শুনে ভয়ে কেঁপে উঠলো সবাই। কার্ত্তিক এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। পড়ি কি মরি অবস্থায় সে ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

বন্দুকের গুলী কারও গায়ে না লাগলে কি হবে, চারিদিকে একটা তুমুল হট্টগোল পড়ে গেল। সুবল ছুটেছে লাঠি হাতে অশ্বিনীর মাথা ফাটাতে, বন্দুক নিয়ে ছুটেছে কিষণ সিং, বাবাকে বাঁচাবার জন্যে ছুটোছুটি করছে বিজয়।

বনমালীও প্রাণপণে গেট কেটে চলেছে। দেখতে দেখতে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো গেট। চেঁচিয়ে উঠলো বনমালী, যাও যাও, তোমরা প্রতিমা নিয়ে এগিয়ে যাও তাড়াতাড়ি—এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকো না।

বাঁধভাঙা স্রোতের মতো চক্ষের পলকে লোকজন সবাই চ'লে গেল প্রতিমা নিয়ে। শুধু সুবল তখনও কিষণ সিংয়ের হাত থেকে বন্দুকটা কাড়বার জন্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে চ'লেছে। আর বিজয় ভবানী চৌধুরীর হাত ধ'রে টানছে: চলে এসো বাবা, চ'লে এসো।

বনমালীও ডাকতে লাগলো, বাবু, বাবু চলে আসুন আপনি।—শীগগির চলে আসুন।

সুবলকে একলা ফেলে যেতে ভবানী চৌধুরীর মন সরছিল না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই হাত মুচড়ে সুবল তার বন্দুকটা কেড়ে নিলে। রাগে অপমানে কিষণ সিং পাগলের মত ছুটে এলো বিজয়ের দিকে। বিজয়ের জন্যেই তো এত হাঙ্গামা! বিজয়কে কোলপাঁজা ক'রে তুলে নিয়ে তর-তর করে নহবৎ-খানার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল কিষণ সিং। দাঁত কড়মড় ক'রে ব'লতে লাগলো, চল্ তোকেই এবার শেষ করি।

কিষণ সিংয়ের কবলে প'ড়ে বিজয় কাঁদছে, 'বাবা ব'লে করুণ কণ্ঠে কাকুতিমিনতি করছে—এ দৃশ্য দেখে ভবানী চৌধুরী আর স্থির থাকতে পারলেন না। বন্দুক টেনে নিলেন তিনি সুবলের হাত থেকে। যে

মুহূর্ত্তে কিষণ সিং বিজয়কে তুলে ধ'রে একতলায় আছড়ে ফেলতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ভবানী চৌধুরীর হাতের বন্দুক কিষণ সিংয়ের বুকের পাঁজর লক্ষ্য ক'রে গর্জ্জন ক'রে উঠলো। ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করবার সময়ও আর কিষণ সিং পেলে না। তার প্রাণহীন দেহটা একেবারে সিঁড়ির ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে এসে পথের ধূলোয় মুখ থুবড়ে পড়লো। বিজয়ও কিষণের কোল থেকে প'ড়ে যাচ্ছিল—তাড়াতাড়ি এসে তাকে লুফে নিল স্বর্ণ।

ভবানী চৌধুরী কাঁপতে লাগলেন থর্‌থর্ ক'রে। এমন একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটবে তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। তিনি তো কিষণ সিংকে মারতে চান নি, তিনি শুধু চেয়েছিলেন তাঁর একমাত্র ছেলে বিজয়কে বাঁচাতে।

বনমালী তাঁর হাত ধ'রে টানতে টানতে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল খুনের জায়গা থেকে।

বড় রায় এলেন, অশ্বিনী এলো। অশ্বিনী দেখলো কিষণ সিংয়ের তখন আর কিছু করবার নেই, সব শেষ হ'য়ে গেছে। নিজের হাতের ওপর ঘুসি মেরে অশ্বিনী ব'ললে, চৌধুরীকে যদি না ফাঁসি কাঠে ঝোলাতে না পারি তো আমার নাম অশ্বিনী নয়।

প্রতাপ রায় বললেন—চৌধুরীকে ফাঁসি দিলেই কি কিষণ সিং আবার বেঁচে উঠবে অশ্বিনী ?

অশ্বিনী বললে—যা হবার হবে—তুমি শুধু চোখকাণ বুজে ব'সে থাকো। চুপ ক'রেই গেলেন প্রতাপ রায়। বাড়ীর ভেতর থেকে ছুটতে ছুটতে এলো বিমলা : কী হোল দাদু, কথা ব'লছো না যে ?

বড় দুঃখে ম্লান হাসি হেসে বৃদ্ধ রায় বললেন, না বিশেষ কিছুই হয় নি দিদি, আজ আমাদের বিজয়া-দশমী হোল।

খুনের খবর সদরে পৌছুতে দেরী হোল না। মোটর-বাইক হাঁকিয়ে

পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ এলেন এন্‌কোয়ারিতে। যথেষ্ট খাতির যত্ন ক'রে অশ্বিনী তাঁকে জানালে: রায় আর চৌধুরীদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বংশানুক্রমেই চ'লে আসছে। দু'পক্ষই প্রবল জমিদার বংশ। তবে চৌধুরীদের এখন পড়ন্ত অবস্থা। আর বরাবরই চৌধুরীরা রায়েদের হিংসে করে—গায়ে প'ড়ে ঝগড়া বাধায়। বিশেষ ক'রে রায়েদের জমিতে কয়লা ওঠার পর থেকে ওদের আক্রোশ আরো বেড়ে গেছে রায়েদের ওপর। ওরা কলিয়ারী ক'রতে পারলে না, রায়েরা করলে—এই হোল ওদের গাত্র দাহের আসল কারণ।

পুলিশ-সুপারকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ দিলে অশ্বিনী, আর সেই সঙ্গে অনেক ক'রে অনুরোধ করলে: ভবানী চৌধুরীকে গ্রেপ্তার ক'রে হাতে হাতকড়া দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে আমাদের এই সদর দিয়ে নিয়ে যেতে হবে স্যার! This is my earnest request. তার জন্যে যদি কিছু মনে না করেন, আমি কিছু খরচপত্র ক'তেও রাজী আছি।

ঠিক এই আশঙ্কাই করছিল বনমালী। ভবানী চৌধুরীর মতো একজন মানী লোককে পুলিশ এসে হাতকড়া পরিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে ধ'রে নিয়ে যাবে একথা ভাবতেও তার সারা গা রী-রী করছিল। সে তাই পালাবার পরামর্শ দিলে চৌধুরীকে। ব'ললে, আসুন আমার সঙ্গে, আপনাকে আমি নিরাপদে সরিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু ধর্ম্মভীরু লোক ভবানী চৌধুরী। পালাতে তাঁর কিছুতেই মন ওঠেনা। আক্ষেপ করে তিনি বললেন এত বড় একটা অন্যায় করলাম, তার শাস্তি পাবনা?

ভবানী চৌধুরীর স্ত্রী মহামায়া বুঝতে পারলেন না এতে অন্যায়টা কোন্‌খানে। স্বামীকে বোঝালেন তিনি: ছেলেটাকে বাঁচাতে গিয়ে লোকটাকে মেরে ফেলেছ, তুমি তো ইচ্ছে ক'রে মারো নি।

চৌধুরী বললেন, ইচ্ছেয় হোক্ অনিচ্ছেয় হোক্ মেরে তো ফেলেছি। তার প্রাণ তো গেছে আমারই হাতে!

বনমালী বললে, ভালোই হ'য়েছে। অতি বজ্জাত লোক ছিল ব্যাটা। আপনার হাতে প্রাণ গেছে—ব্যাটার স্বর্গবাস হ'য়ে গেছে। আপনি এখন আসুন তো আমার সঙ্গে।

চৌধুরী বললেন, বলছো যখন চল, কিন্তু পালিয়ে আর কতদিন থাকবো?

বনমালী বললে, পালিয়ে থাকতে হবে কেন? পথের ধারে নামিয়ে দেবো আপনাকে, কাঞ্চনপুর ষ্টেশনে গিয়ে আপনি ট্রেণ ধরবেন। তারপর কলকাতায় গিয়ে আপনার উকীল ব্যারিষ্টারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তারা যা বলবে তাই করবেন।

তবু কিন্তু যাবার বেলায় চৌধুরী বরাবর ক'রে সবাইকে মনে করিয়ে দিয়ে গেলেন: আমার যদি কিছু হ'য়ে যায়, তোমাদের আমি ব'লে গেলাম, ওই যে-লোকটি মারা গেল, তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্যে যত টাকা লাগে, দেবে।

শ্রদ্ধায় চোখ ছল্‌ছল্ ক'রে উঠলো মহামায়ার। এমনি আপনভোলা স্বামী তার! নিজের এত বড় বিপদ সে-কথা একবারও না ভেবে কোথাকার কে একজন সামান্য চাপরাশী, তার দুর্গত পরিবারের জন্যে অস্বস্তির শেষ নেই!

বিজয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন ভবানী চৌধুরী, মহামায়াকে আশ্বাস দিয়ে গেলেন কিছু ভেবো না তোমরা। তাঁর যা ইচ্ছে তাই হবে। আমি চ'ললুম।

খিড়কীর দরজায় জুড়ি গাড়ী তৈরী হ'য়েই দাঁড়িয়ে ছিল। বাড়ীর পেছনের বাগানের ভেতর দিয়ে লুকিয়ে এসে বনমালী আর ভবানী চৌধুরী গাড়ীতে উঠলেন। গাড়ী ছাড়বে ঠিক এমন সময় কোত্থেকে

একটা কনেষ্টবল এসে পথ আটকে দাঁড়ালো। তার ডিউটী ছিল আসামীর ওপর কড়া নজর রাখার যাতে সে কিছুতেই না পালাতে পারে। গাড়ীর দরজা ধ'রে কনেষ্টবল বললে, উতর্ যাও, উত্‌রো!

নায়েব বনমালী বললে, উতর যাব কি রে! তোদের বাবুর কাছেই তো যাচ্ছি। তুইও আয়না ওই পাদানিতে চ'ড়ে।

কনেষ্টবল যেই পাদানিতে চড়বে ব'লে পা বাড়িয়েছে, বনমালী এক ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিলে রাস্তার ওপর। কনেষ্টবল উল্‌টে প'ড়ে গেল, গাড়ী ছেড়ে দিলে ঝড়ের বেগে।

পুলিশ ইন্স্‌পেক্টর আসছিল ঘোড়ায় চেপে। কোনমতে উঠে, ছুটতে ছুটতে গিয়ে কনেষ্টবল তাকে খবর দিলে: আসামী পালিয়েছে।

কোন্ পথে পালিয়েছে জেনে নিয়ে পুলিশ-ইন্স্‌পেক্টর সেইদিকে ঘোড়া ছোটালো। যাবার সময়ে কনেষ্টবলকে ব'লে গেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে খবর দিতে।

তারপর দেখতে দেখতে গ্রামের রাস্তায় যেন গাড়ীঘোড়ার 'রেস্' সুরু হ'য়ে গেল: পঁই পঁই ক'রে জুড়ি-গাড়ী ছুটছে, তার পিছু পিছু ইন্স্‌পেক্টরের ঘোড়া ছুটছে টগ্‌বগ্ টগ্‌বগ্ ক'রে—আর দূরে ধূলো উড়িয়ে ভট্‌ভট্ শব্দ ক'রে আসছে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-সাহেবের মোটর সাইকেল। দৌড়ের পাল্লায় কেউ কারুর চেয়ে কম্‌তি যায় না। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই মোটর সাইকেলই আগে বেরিয়ে গেল ইন্স্‌পেক্টরের ঘোড়াকে পেছনে ফেলে। চৌধুরীদের জুড়ি-গাড়ী কিন্তু তখনও অনেক দূরে।

মোটর-সাইকেলের 'স্পীড্' আরো বাড়িয়ে দিলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-সাহেব। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চৌধুরীর গাড়ীকে ধ'রে ফেললেন তিনি। কিন্তু গাড়ী থামলে কি হবে?

অনেক আগেই গাড়ী থেকে ভবানী-চৌধুরীকে নামিয়ে দিয়েছে বনমালী।

সাহেব ভবানী চৌধুরীকে চেনেন না। বনমালীকে গাড়ীতে দেখে তিনি তাকেই আসামী ভেবে পাকড়াও করলেন। কয়েক কথা জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ইন্স্পেক্টর এলো ঘোড়ায় চ'ড়ে। বনমালীকে দেখে সে বললে, এ কি! এতো চৌধুরী নয়—এযে চৌধুরীর ম্যানেজার।

বনমালী বললে, আমিও তো তাই ব'লছিলাম এতক্ষণ। আমি কেন চৌধুরী হ'তে যাব? আমি চৌধুরীর নায়েব বনমালী। চৌধুরী গেছেন ক'লকাতায়, আমি যাচ্ছি সদরে—জমিদারীর কাজে।

পুলিশ-কর্ত্তারা দেখলো আসল আসামী হাতছাড়া হয়ে গেছে। অগত্যা বনমালীকেই তারা গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল।

মহকুমার আদালতে হাজির করা হোল বনমালীকে। খুনী নিজে ফেরার, তাছাড়া আসামী পক্ষের প্রভাব-প্রতিপত্তি অসাধারণ। পাছে সমস্ত সাক্ষী নষ্ট ক'রে দেয়, তাই কোর্ট-ইন্সপেক্টর বনমালীর জামিন মঞ্জুর করাতে একেবারেই নারাজ। বরং চৌধুরীর নামে যাতে একটা 'ওয়ারেণ্ট' বে'র করা যায় তারই চেষ্টা সে করছিল। কিন্তু 'ওয়ারেণ্টে'র আর দরকার হোল না। ভবানী-চৌধুরী ব্যারিষ্টার সঙ্গে নিয়ে নিজেই এসে কোর্টে ধরা দিলেন। ব'ললেন, আমিই ভবানী-চৌধুরী। পালাইনি আমি, নিজেই এসে সারেণ্ডার করছি।

ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কিছু বলবার আছে?

চৌধুরী বললেন, যা বলবার আমার ব্যারিষ্টার বলবেন।

কোর্ট-ইন্সপেক্টর জেরা করলে, আপনিই কি কিষণ-সিংহকে খুন ক'রেছেন?

অকপটভাবে স্বীকার করলেন ভবানী চৌধুরী: আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই খুন ক'রেছি।

ভবানী চৌধুরীর শালা কালোবরণ ঘোষ ওরফে কালু আদালতের খবরটা নিয়ে এলো মহামায়ার কাছে। বললে, একেবারে আদালতেই

গিয়েছিলুম দিদি। জামাইবাবু নিজে হাজির হ'য়ে দিলে কবুল ক'রে। বললে, হ্যাঁ, আমিই খুন ক'রেছি।

মহামায়া বললেন, মিছে কথা ও যে কিছুতেই বলবে না সে তো আগে থেকেই জানি। জামিন কি কোন উপায়ে পাওয়া গেল না, কালু?

কালু বললে, জামিন আর দেয় কখনো! পুলিশ বললে, বড়লোক, সাক্ষী ভাঙ্গিয়ে দেবে। তবে আমিও আবার চেষ্টা করে দেখি—সহজে ছাড়বো না। হাজার খানেক টাকা আমাকে দে তো!

নৈবেদ্যের থালা হাতে পূজোর ঘরে যাচ্ছিলেন মহামায়া। জিজ্ঞেস করলেন, টাকা কি এক্ষুনি চাই?

কালু বললে, তা এদিকে যতো দেরী করবি, ওদিকেও তত দেরী হ'য়ে যাবে।

মামলা মোকদ্দমার ব্যাপার। কোনরকম গড়িমসি করা উচিত নয় ভেবে মহামায়া কালুকে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ডেকে নিয়ে গেলেন। শোবার খাটের গদীর নীচে ছিল সিন্দুকের চাবি। দেখিয়ে দিয়ে বললেন, আমি এখন সিন্দুক ছোঁবো না। এইখানে সিন্দুকের চাবি আছে, তুই নিজের হাতে সিন্দুক খুলে টাকা বে'র ক'রে নে।

সিন্দুক খুলে? নিজের হাতে?—কালু তো একেবারে অবাক! এতখানি বিশ্বাস তো কেউ তাকে করে না। একটু কিন্তু ক'রে সে বললে, বলছিস যখন, নিচ্ছি। তুই না-হয় মা'র পেটের ভাইকে বিশ্বাস ক'রে বললি, কিন্তু তোর সেই নায়েবটা—ওই যে পাকা পাকা গোঁফ, কি নাম যেন ছাই বনমালী—

—হ্যাঁ, বনমালী। তাকেও তো দেখলাম আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে। সে আবার কিছু না বলে।

—না না সে কিছু বলবে না, তুই নে।

কালুকে অভয় দিয়ে মহামায়া পূজোর ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

সিন্দুকের চাবি হাতে পেয়ে কালুর আর কোন দিকে চাইবার অবসর ছিল না। একটা জমিদার বাড়ীর টাকার সিন্দুক হাতে পাওয়া কি সোজা কথা! তাড়াতাড়ি ক'রে কাজ হাঁসিল ক'রতে না পারলে কে আবার কোথা থেকে দেখে ফেলবে, তাই চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলে কালু যা সামনে দেখলো তাই হাতাতে সুরু করলো। সঙ্গে সঙ্গে মুখেও তার খই ফুটতে লাগলো: আমি এত তাড়াতাড়ি করছি কি আর সাধে? ভবানী চৌধুরীর মতন অতবড় একটা লোক—চোর-চণ্ডালের সঙ্গে গারদঘরে পোরা থাকবে, যত তাড়াতাড়ি জামিনটা হ'য়ে যায় ততই ভালো।

কথা বলতে বলতে একবার আড়চোখে দেখে নিলে কালু, ধারে কাছে কেউ কোথাও নেই, দিদিও চোখের আড়ালে চ'লে গেছে। মনের আনন্দে সে তখন ফতা পারলো তাড়াতাড়ি নোট বে'র ক'রে এ-পকেট সে-পকেট বোঝাই করতে লাগলো। হাত সাফাই করার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে নিজের সাধুগিরিও জাহির করতে সে বাকী রাখলো না: পরের জিনিষ, কাজ কি বাবা কম-বেশী নিয়ে? গুণে গুণে ঠিক হাজার টাকাই নিচ্ছি। সিন্দুক বন্ধ ক'রে চাবিটাও আবার ঠিক জায়গামতই রেখে যাচ্ছি।

গদীর নীচে চাবিটা রেখে, বুকে মাথায় আলোয়ান জড়িয়ে কালু যেমনটী এসেছিল তেম্‌নই আবার গুট্‌গুট্‌ ক'রে স'রে পড়ার তালে ছিল। যাবার মুখে মহামায়া বললেন, জামিনের জন্যে খুব চেষ্টা করিস্ কালু।

কালু বললে, এলুমই তো সেই জন্যে।

মহামায়া বললেন, আমার আবার ভয় হ'চ্ছে, ওই যে পুলিশ কি সব বলেছে বললি!

কালু বললে, কী আর বলবে? বল্‌ছে—ইন্‌ফুলো শিয়াল্ লোক—

মহামায়া কালুর কথাটা বুঝতে পারেন না। কালু নিজেও জানে না যে কথাটা আসলে কী। কোর্ট-ইন্সপেক্টর যে ইম্‌ফুলোশিয়াল্ বলে নি,

বলেছিল Influential যার মানে প্রতিপত্তিশালী—অত শক্ত বুঝবার মতো বিদ্যে কালুর পেটে নেই।

ভুল কথাটাই আবার আওড়ায় সে। বলে, ইন্‌ফ্লোশিয়াল্‌ লোক—ওসব ইংরেজী কথা, তুই বুঝবি না। সোজা কথায় পুলিশ বললে বাইরে থাকলে জামাইবাবু সাক্ষী ভাঙ্গিয়ে দেবে।

বিজয় আবার এমন সময়ে খবর নিয়ে এলো রায়েরা সাক্ষীদের সব শিখিয়ে পড়িয়ে নিচ্ছে। মহামায়া আরো ঘাব্‌ড়ে গেলেন। বল্‌লেন, ওরা শেখাচ্ছে, আমাদের কী হবে ?

কালু বললে—আমরাও শেখাব। তবে, সাক্ষীদের কিছু কিছু ইয়ে দিতে হবে যে। সে টাকা তো নেওয়া হোল না।

মহামায়া ব্যস্ত হয়ে বললেন, নাও না তোমার যত চাই। নিতে তো বলছি। কালুর ভয় হয়, বেশী লোভ করতে গিয়ে পাছে সে ধরা পড়ে যায়। ভিজে বেড়ালটীর মতো ঢোঁক গিলতে গিলতে সে বলে, বলছো তো নিজে ; কিন্তু আমার যে ভয় করে। পরের টাকা, নিজের হাতে বারবার সিন্দুক খুলে—। না দিদি, সে তুমি পরে দিও। ও টাকা পরে দিলেও চলবে। আর সাক্ষী পিছু কী-ই বা এমন হাতীঘোড়া দেবে ওরা ! হয় পাঁচ টাকা, নয়তো দশটাকা। সে আমি নিজের পকেট থেকেই চালিয়ে নেবো এখন।

আর বেশী বাক্যব্যয় না করে নিজের পকেট সামলাতে সামলাতে কালু একপা' একপা' করে বেরিয়ে গেল দিদির বাড়ী থেকে।

কালু যখন আদালতে এসে পৌছুলো তখন পুরোদমে সাক্ষীদের শুনানী চলেছে। লোকজনের ভীড়ে থম্‌ থম্‌ করছে আদালত ঘর। ঘরের ভেতরে দর্শকদের গ্যালারীতে আর তিল রাখবার জায়গা নেই। কালু যতো ঘরে ঢুকবার জন্যে পেড়াপীড়ি করে কনেষ্টবল ততই বাধা দিয়ে বলে, নেহি নেহি বাবু মাপ কিজিয়ে।

মহামুস্কিল। কালু ভালো হিন্দী বলতে পারে না, কেমন ক'রে সে হিন্দুস্থানী পাহারাওলাকে বোঝাবে যে এ মামলায় তার কতখানি মাথাব্যথা!

কনেষ্টবলকে সে বলে, নেহি নেহি বলছো কেন বাবা, আসামী আমার বোনাই হোতা বোনাই, ঘরের লোক; আমাকে ভেতরে যেতে দেবে না! সে কি হয়?

কনেষ্টবল বলে, হাঁ হাঁ ঘরের লোক তো সব হি আছে।

কালু তবু বোঝায়, না বাবা, ঘরের লোক ত সবাই নেহি আছে, সব গাঁকা লোক আছে, ঘরকা লোক আমি একাই আছে। তুম্ বোনাই বুঝ্‌তা নেহি? ভগ্নিপতি—মানে ভগ্নিকা পতি হ্যায়। গোলমাল করে গা নেই বাবা, চুপকে চুপকে যায়ে গা, আর চুপকে চুপকে বসে গা।

কালু একেবারে নাছোড়বান্দা। কনেষ্টবল কতক্ষণ আর তাকে ঠেকিয়ে রাখবে? একবার ফাঁক পেয়েই কালু ভেতরে ঢুকে পড়ে: লাফাতে লাফাতে হাঁপাতে হাঁপাতে লোকজন সরিয়ে বেঞ্চির মাঝখানে এসে বলে: একটু জায়গা দিন মশাই বসি। দায়রাকা বিচার হোতা, সাক্ষীকা জেরা হোতা, বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করতা।

বুক ধড়াস্ ধড়াস্ ক'রবারই কথা বটে! ক'লকাতার জবরদস্ত ব্যারিষ্টার তখন জেরায় জেরায় বিবাদী পক্ষের সাক্ষীদের একেবারে নাস্তানাবুদ ক'রে তুলেছিলেন। রায়-বাবুদের বাড়ীর সামনের গেটটি যে বিজয়া দশমীর দিনেই আড়াআড়ি ক'রে তৈরী হয়েছিল, কিষণসিংকে গুলী করবার আগেই যে চৌধুরীর ছেলে বিজয়কে নিয়ে কী-একটা হাঙ্গামা হয়েছিল এসব রায়েদের সাক্ষীদের মুখ থেকেই ফাঁক করাতে তাঁর বেশীক্ষণ সময় লাগলো না।

শেষ পর্য্যন্ত সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে উঠলো কার্ত্তিক। যেমন বকের মতন চেহারা তার, তেমনি একটা ঠাকুর্দ্দার আমলের শততালি-দেওয়া কালো কোট পরে তাকে একেবারে বহুরূপীর মতো দেখাচ্ছিল। কাঠগড়ায়

উঠেই সে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো: তাড়াতাড়ি করুন মশাই, তাড়াতাড়ি করুন, আমার আবার হাই উঠছে। নেশা ভাং করি কিনা!

ব্যারিষ্টার জিজ্ঞাসা করলেন, কী নেশা করেন?

কার্ত্তিক একটু বিব্রত হ'য়ে বললে, ওই দেখুন, ওসব কথা এখানে কেন; আজ্ঞে, বড় তামুক খাই।

—বড় তামুক!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কলকে ছোট, তামুক বড়। একটান টেনেছেন কি, একেবারে ত্রিভুবন দেখিয়ে দেবে। ওই যে ম'রে গেল কিষণ সিং, ওরই সঙ্গে খেতাম রোজ সন্ধ্যাবেলা।

—কিষণ সিং তাহ'লে আপনার বন্ধু ছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সেইজন্যই তো রায়বাবুদের ওদিক দিয়ে আজকাল আঁধার রাতে আমার আর যাবার জো নেই হুজুর। অপঘাতে ম'রে ব্যাটা ভূত হ'য়েছে যে!

ব্যারিষ্টার জিজ্ঞেস করলেন, তা কে ওকে মারলে বলুন তো?

একগাল হেসে কার্ত্তিক বললে, আজ্ঞে জানেন তো সবই, তবে আর চালাকি করছেন কেন? ভবানী চৌধুরী মেরেছেন গুলী ক'রে।

—ভবানী চৌধুরীর ছেলেকে চেনো?

—বিজয়কে?—খুব চিনি।

—সে তখন কোথায় ছিল?

—থাকতো নাকি? এচোঁড়ে-পাকা ছেলে, বাবা বাবা ক'রে ছুটে গিয়ে ঢুকেছিল সেই ভীড়ের মাঝখানে। বাস্, যেই দেখা আর অমনি আড়কোলা ক'রে তুলে কিষণ সিং বলে কিনা দোবো আছড়ে ফেলে। দিতো—মিছে কথা বলবো কেন, নিশ্চয়ই দিতো, তবে চৌধুরী মশাইয়ের হাতের টিপ ব'লতে হবে—একেবারে সড়াক্ ভুম্। বাস্, কিষণ সিংকে আর মা বলতে হোল না; উলুটে পালুটে একেবারে ডিগবাজি খেয়ে—

খুব একচোট হাতমুখ নেড়ে কার্ত্তিক কিষণ সিংয়ের মৃত্যুদৃশ্য বর্ণনা করতে সুরু করছিল, ব্যারিষ্টার তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, থাক আর ব'লতে হবে না। গেটটা কেন তৈরী হয়েছিল বলেই আপনি চলে যান।

আচ্ছা বিপদেই পড়লোকার্ত্তিক। এসব তার বলবার কথা নয়। তাছাড়া একভরি গাঁজার দাম তার খামোখা নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। টাইম্‌-বাঁধা নেশা, টাইমে না খেলে যে পেট ফুলে জয়ঢাক হ'য়ে যায়, সেতো আর বিলেত ফেরত ব্যারিষ্টার বোঝে না। বিরক্ত হয়ে সে বললে, ও-গেট হতো নাকি? আমি বললাম, তবে তো হোল!—দু-বাড়ীতেই দুর্গোপূজো হয় কিনা, তা' এবছর চৌধুরীদের পিতিমে একটু বড় হ'য়েছিল।

—চৌধুরীদের প্রতিমা বড় হ'য়েছিল?

—আজ্ঞে না, বেশি বড় নয়, আধ হাত খানেক। তা মিছে কথা কেন বলবো, আধহাতের চেয়ে আঙুল দুই বরং ছোট হবে।

ব্যারিষ্টার বললেন, তাই বুঝি এই গেটটা তৈরী হোল—প্রতিমার চালিটা গেটে আটকে যাবে বলে?

কার্ত্তিক দেখল ব্যারিষ্টার সাহেব সব জেনে শুনে ন্যাকা সাজছেন। অনুনয় ক'রে সে বললে—এই তো, জানেন সবই, কেন অযথা আমাকে হায়রাণ করছেন? ছেড়ে দিন না আমাকে, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

আর বেশী জেরা করবার দরকার ছিল না ব্যারিষ্টারের। কার্ত্তিকের টাইম-বাঁধা নেশার খাতিরে তিনি সেদিনকার মতো রেহাই দিলেন তাকে।

সাক্ষী দিয়ে কার্ত্তিক যেন একেবারে লঙ্কা-বিজয় করে এসেছে! মহা ফূর্ত্তিতে আদালতের বাইরে বেরুতেই অশ্বিনী রায় ধমক দিয়ে বললে, তুই সব মাটি করে' দিলি হতভাগা, ওসব কথা বলতে গেলি কেন?

কার্ত্তিক দ'মবার পাত্র নয়। সে বললে, যা ব'লেছি ওতেই দেখো চৌধুরীর ফাঁসি হ'য়ে যবে।

অশ্বিনী রায় বিদ্রূপ ক'রে ব'ললে, হ্যাঁ, ফাঁসি হয়ে যাবে না ঘোড়ার ডিম হবে!

কার্ত্তিক দেখলো তার কথায় বাবুর বিশ্বাস হচ্ছে না। জামার তলা থেকে সে তার পৈতাটা তাড়াতাড়ি টেনে বের করলো। পৈতে ধরে বললে এই আমি পৈতে ছুঁয়ে বলছি—ফাঁসি যদি না-হয় তো আমি বামুন থেকে খারিজ।

এমন ভবিষ্যদ্বাণীতে অশ্বিনী রায় নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত হ'য়েছে ভেবে কার্ত্তিক তখন আসল কথাটা পাড়লো: গাঁয়ে এবার ঝুমুর-নাচ লাগাই গিয়ে তা'হলে। আসবার সময়েই আমি তার বায়না দিয়ে এসেছি।

অশ্বিনী রায় বললে, বেশ করেছিস, তোর যা খুসী তাই কর।

কার্ত্তিককে আর পায় কে? ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হৌক বাবু একবার যখন বললে তোর যা খুশী তাই কর, তখন বাবুর হুকুম হ'য়েই গেছে বলতে হবে।

গাঁয়ে ফিরে এসেই কার্ত্তিক ঝুমুর-নাচের আসর বসিয়ে দিলে। সবাইকে ব'ললে, বাবুর হুকুম হ'য়ে গেছে। যতো খুশী ফুর্ত্তি লাগাও!

রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপ কয়েকদিন ধ'রে লোকজনের ভীড়ে, আর নাচগানের হুল্লোড়ে একেবারে জম্‌জমাট হ'য়ে উঠ্‌লো। কার্ত্তিক একাই একশো লোকের উৎসাহ নিয়ে ঘুরে ফিরে বাহবা দিয়ে আসর মাতিয়ে তুললো। মামলায় যে রায়েদেরই জিত্‌ একেবারে সুনিশ্চিত, এবিষয়ে ছোট বড় কারুরই আর কোন সন্দেহ রইল না। কার্ত্তিক তো নিজেই বড় গলা করে বলতে লাগলো যে, এমন সাক্ষী সে দিয়েছে যাতে ভবানী চৌধুরীর ফাঁসি না হয়ে আর যায় না।

ভগবানের ইচ্ছা কিন্তু অন্যরকম। নাচের আসরেই একজন খবর নিয়ে এলো, ভবানী চৌধুরী খালাস পেয়ে গেছেন।

কার্ত্তিক তো ক্ষেপে আগুন। যে-লোকটা খবর এনেছে তাকে সে

তেড়ে মারতে যায় আর কি! বলে, তোর কথাতেই খালাস পেয়ে গেল? খালাস অমনি পেলেই হোল কিনা! খুন ক'রে কখনো খালাস হয়?

লোকটা ব'ললে, হয় কিনা একবার ছ্যাখ না রাস্তায় গিয়ে। ভবানী চৌধুরী জুড়ি-গাড়ীতে চ'ড়ে ড্যাং-ড্যাং ক'রে বাড়ী যাচ্ছে, আমি নিজের চোখে দেখে এলুম।

কার্ত্তিকও তাড়াতাড়ি দেখতে ছুটলো ব্যাপারটা সত্যি কিনা।

রাস্তায় বেরিয়ে দেখে, সত্যিই তো বটে! ভবানী চৌধুরীর জুড়ি-গাড়ী একেবারে ঝম্‌-ঝম্‌ ক'রে চলেছে, গাড়ীতে ব'সে আছেন ভবানী চৌধুরী, তাঁর শালা কালু, আর নায়েব বনমালী। কার্ত্তিক ভেবে দেখলো এতবড়ো একটা মামলা থেকে রেহাই পেয়ে চৌধুরীদের মেজাজ এখন দিল্‌দরিয়া থাকবার কথা। তাছাড়া কার্ত্তিকের কাছে রায় জিতলেও যা, চৌধুরী জিতলেও তাই। বরং এই সুযোগে একটু চালাকী করলেই চৌধুরীবাবুর কাছ থেকে কিছু বখশিস্‌ আদায় করা চলে। কার্ত্তিক তাই বাবু-বাবু ব'লে ছুটতে ছুটতে গিয়ে গাড়ী থামালো।

তাড়াতাড়ি ভবানী চৌধুরীর পায়ের ধূলো নিয়ে সে বললে, আমি জানি আপনি বেকসুর খালাস পেয়ে আসবেন হুকুর। মা-কালীর কাছে আমি মানৎ ক'রেছিলুম যে!

সঙ্গে সঙ্গেই নায়েবের সামনে হাত পাতলো কার্ত্তিক: কই, দশটা টাকা দাও, মায়ের মানৎ শোধ করতে হবে।

পথের মাঝে গাড়ী দাঁড় করিয়ে টাকা চাওয়াটা বাবুর শালা কালুর বরদাস্ত হচ্ছিল না। কিন্তু কার্ত্তিকের সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা তার সাধ্য নয়।

কার্ত্তিক তাগিদ দিতে লাগলো: মায়ের পূজোর টাকা দিতে আর ফষ্টি-নষ্টি কোরো না, বাবা। এ মা তো আর সহজ মা নয়, একেবারে

মা-কালী, সব সময়ে জিব বের করেই আছে। মায়ের মূর্ত্তি দেখলেই বুকের রক্ত জল হয়ে যায়।

কার্ত্তিকের কথার ঢং দেখেই সবাই বুঝলো যে একটা কথাও তার সত্যি নয় তবু একবার যখন সে ধ'রেছে তখন টাকা না আদায় করে যে সে কিছুতেই ছাড়বে না—এও ভবানী চৌধুরী ভালো করেই জানতেন। কাযেই আর কথা না বাড়িয়ে তিনি নায়েবকে বললেন, দিয়ে দাও ওকে দশটা টাকা।

দশটা টাকা পেয়ে কার্ত্তিকও মনের আনন্দে ফিরে চ'ললো তার নিজের আড্ডায়।

চৌধুরী-বাড়ীর এতবড় একটা বিপদ কেটে গেল। মহামায়ার ইচ্ছা যে, বাড়ীতে এবার একদিন একটা যাত্রা গান-টান হয়। কিন্তু সেকথা নিজের মুখে কর্ত্তাকে জানাবার সাহস ছিল না তাঁর। তাই কালুকে ডেকে তিনি কর্ত্তার কাছে কথাটা পাড়তে বললেন। কালুরও জামাইবাবুকে ভয় কম নয়। যেরকম রাসভারী লোক তিনি, তা'তে নাচ-গানে পয়সা নষ্ট করার ব্যাপারে তিনি সহজে সায় দেবেন না। তবু ছোট ছেলে বিজয় আব্দার করছে শুনলে হয়তো তাঁর মন ট'লতে পারে এই ভেবে বিজয়কে সঙ্গে নিয়ে কালু জামাইবাবুর কাছে গিয়ে হাজির হোল।

ভবানী চৌধুরীর শরীর, মন কোনটাই বিশেষ ভালো ছিল না। কয়েকদিন হাজতবাসের অনিয়ম গেছে, তা'ছাড়া কিষণ সিংয়ের স্ত্রী-পুত্রের দুর্ভাবনা কিছুতেই তিনি মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিলেন না। নায়েবের কাছ থেকে যদিও তিনি শুনেছেন যে আপনার জন বলতে কিষণসিংয়ের কেউ কোথাও নেই, তবুও তাঁর পূরোপুরি স্বস্তি হচ্ছিল না। কিষণসিংয়ের ঘরসংসার সম্বন্ধে ভালো ক'রে খোঁজ খবর করাবার জন্য মনটা তাঁর ছটফট করছিল। এমন সময়ে কালু এলো আমোদ-আহ্লাদের প্রস্তাব নিয়ে। ব'ললে, তোমার ফাঁসিটাসি হবে ভেবে রায়েরা ক'দিন

খুব ফূর্তি লাগিয়েছিল, টাকা দাও, এবার আমরাও দেখিয়ে দি ফুর্তি কা'কে বলে!

চৌধুরী মাথা নেড়ে বললেন, না রে না, মানুষ খুন ক'রে ফুর্তি করতে নেই।

কালু বললে, বা-রে! রায়েরা করেছিল যে!

চৌধুরী বললেন, সেইজন্যেই তো আরো বেশি ক'রে আমাদের কিছু করা উচিত নয়।

কালু দেখলো তার জামাইবাবুটি নিতান্তই বেরসিক। বলা কওয়ায় কিছু সুবিধে হবে না দেখে কালু চ'লে যাচ্ছিল, হঠাৎ নায়েব বনমালী তাকে পিছু ডাকলো : টাকার হিসেবটা আমাকে দিয়ে যাও তো, কালুবাবু। আমরা যখন হাজতে ছিলাম, মোকর্দ্দমা তদ্বির করবার নাম ক'রে পাঁচটি হাজার টাকা তুমি নিয়েছ আয়রণ চেষ্ট খুলে। সেই টাকার হিসেব না পেলে আমি হিসেব লিখতে পারছি না।

কালু বিরক্ত হ'য়ে বললে, আচ্ছা ফ্যাসাদে লোক তো তুমি! হিসেব দাও বললেই দাও! আদালতের এলোপাথাড়ি খরচ—আমি একবার বাড়ী যাব—বাড়ী থেকে ফিরে এসে সে সব দেখা যাবে। এত তাড়াতাড়ি কিসের? কত টাকাই বা নিয়েছি?

বনমালী বললে, বাবুর টাকা কত যে নিয়েছ তার ঠিক-ঠিকানা নেই, বাবু ঠিক বলতেও পারছেন না। সিন্দুকের ওপরের থাকে ছিল আমার টাকা, তাই থেকেই তো নিয়েছ পাঁচ হাজার।

কালু ব'ললে, বললেই হোল পাঁচ হাজার? আমি পাঁচহাজার নিই নি, নিয়েছি এক হাজার। চল' তুমি দিদির কাছে, আমি এখুনি মোকাবিলা ক'রে দিচ্ছি।

দিদির কাছে আর যেতে হোল না। ভবানী চৌধুরীই মীমাংসা ক'রে বল্লেন, থাক তোকে আর হিসেব দিতে হবে না, তুই যেখানে যাচ্ছিলি যা।

কালু তো পালিয়ে বাঁচলো। চৌধুরী নায়েবকে বললেন, তুমিও যেমন! সিন্দুক খুলেই হাতের কাছে দেখেছে নোটের তাড়া, ওর কি আর তখন হিসেব ক'রে নেবার অবসর ছিল! হাতের মুঠোয় যা এসেছে তাই নিয়েছে।—এখন তোমার হিসেবে যা কম পড়ছে ওর নামে খরচ লিখে দাও।

বনমালী জিজ্ঞেস করলে, পাঁচ হাজার টাকাই খরচ লিখে দেবো? চৌধুরী হেসে বললেন, পাঁচ হাজার কী বলছো বনমালী? মামলায় জিতে গেলাম তাই, নইলে আমি নিজেই তো খরচের খাতায় গিয়ে প'ড়েছিলাম।

সত্যি কথা বলতে, দিনরাত্তির খুনের কথা ভেবে ভেবে চৌধুরীর শরীর ভেতরে ভেতরে একেবারেই ভেঙে পড়েছিল। দিনের দুশ্চিন্তা আর রাতের দুঃস্বপ্নের হাত থেকে কিছুতেই তিনি রেহাই পাচ্ছিলেন না। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখতেন, কিষণ সিং সিঁড়ির ওপর থেকে আছড়ে ফেলে দিচ্ছে বিজয়কে, আর বিজয়কে বাঁচাতে গিয়ে তিনি গুলী চালাচ্ছেন কিষণ সিংহের বুকে। আর্ত্তনাদ ক'রে তাঁর ঘুম ভেঙে যেত। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠতেন: না-না-না, আমি তোমাকে মারতে চাই নি—আমি তোমাকে মারতে চাই নি।

শুধু একরাত্রেই নয়, প্রতিরাত্রে এই একই ধরণের দুঃস্বপ্ন যেন ভূতের মতন তাঁকে পেয়ে বসেছিল। মহামায়া তাঁকে দুর্ভাবনা করতে বারণ করতেন, তিনি নিজেও সব কিছু ভুলে থাকবার চেষ্টা কম করেন নি, তবু কিছুতেই কিছু ফল হোত না। দিনের বেলাটা কোনরকমে কাজকর্ম্মে কেটে গেলেও, রাত্রির বিভীষিকা যেন কিছুতেই শেষ হতে চাইতো না। একদিন স্বপ্নটা হোল আরো ভয়ঙ্কর রকমের।

স্বপ্ন দেখলেন, কিষণ সিং তাঁর বুকের উপর হাঁটু গেড়ে বসেছে, দু'হাত দিয়ে প্রাণপণে গলা চেপে ধরেছে তাঁর, তিনি না পারছেন উঠে বসতে, না পারছেন কাউকে চেঁচিয়ে ডাকতে। ঘুমের মধ্যেই তাঁর দম প্রায় বন্ধ

হবার যোগাড়। অনেক কষ্টে তিনি গোঁ-গোঁ ক'রতে ক'রতে উঠে বসলেন। দেখলেন, নিজেই নিজের গলা টিপে ধ'রেছেন তিনি—ভয়ে তাঁর গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে। গেলাসে গেলাসে জল গড়িয়ে খেলেন তিনি কুঁজো থেকে। তারপর আবার গিয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

এই যে শয্যা নিলেন ভবানী চৌধুরী, সে শয্যা ছেড়ে আর উঠে বসবার সামর্থ্য হোল না তাঁর। ডাক্তার এসে পরীক্ষা ক'রে বললেন, হার্ট খুব দুর্ব্বল।

ভবানী চৌধুরী নিজেও বুঝতে পারছিলেন, তাঁর সময় ফুরিয়ে এসেছে। বনমালীকে ডেকে তিনি বললেন, তুমি একটি কাজ কর, বনমালী। রায়েদের বাড়ী যাও। অশ্বিনীর বাবা বড় রায়কে গিয়ে বল, তাঁকে আমি ডেকেছি।

বনমালী বুঝতে পারলো না এই মরণাপন্ন অসুখের মধ্যে বড় রায়ের সঙ্গে কর্ত্তামশাইয়ের কী এমন দরকার। সে বললে, এই অসুখের ভেতর ওঁকে আবার ডাকাডাকি কেন?

চৌধুরী বললেন, ওঁকে ডেকে আমি বলবো—আমাদের এই রায় আর চৌধুরীদের বিবাদ-বিসম্বাদটা মিটিতে ফেলতে।

বনমালী সন্দেহ প্রকাশ করলো, উনি কি আসবেন!

চৌধুরী বললেন, আমি যদি সুস্থ থাকতাম, আমি নিজেই যেতাম। তুমি গিয়ে বল, বোধ হয় না এসে পারবেন না।

বনমালী চলে গেল। মহামায়াকে কাছে ডেকে চৌধুরী বললেন, আমি তো চললুম। ভবিষ্যতে যখনি সুযোগ পাবে, আমাদের এই ঝগড়াটা মিটিয়ে নিও। নইলে এই পুরন্দরপুরে রায় আর চৌধুরী বংশের কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকবে না।

রায় কতক্ষণে আসেন তারি জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা করতে

লাগলেন চৌধুরী। তন্দ্রার ভেতর চ'মকে চ'মকে উঠে বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন মহামায়াকে, রায় এলো নাকি ?

মহামায়া বললেন, আসবামাত্রই আমি তোমাকে ডেকে দেবো'খন। তুমি একটু চুপ করে ঘুমোবার চেষ্টা কর।

এদিকে বনমালীর কাছে খবর পেয়েই প্রতাপ রায় চৌধুরীদের বাড়ী আসবার জন্যে বেরুচ্ছিলেন। অশ্বিনী এসে তাঁকে বাধা দিল: আমি বারণ করছি তুমি যেয়ো না বাবা। চৌধুরীর অসুখবিসুখ মিছে কথা। তোমাকে বাড়ীতে ডেকে সে অপমান করবে।

অশ্বিনীর বারণ শুনলেন না প্রতাপ রায়। অশ্বিনীকে বললেন, মানুষকে তুই বড় ছোট ভাবিস অশ্বিনী। চৌধুরী ডাকছে যখন, আমার যাওয়া উচিত। আমি একবার শুনে আসি সে কী বলতে চায়।

অশ্বিনী রাগে গজর গজর করতে লাগলো, যাও, তোমার যা খুশী তাই কর। অপমান করলে তখন যেন আমাকে কিছু বলতে এসো না।

প্রতাপ রায় বুঝলেন, কথা না রাখায় অশ্বিনীর অভিমান হয়েছে। মৃদু হেসে তিনি বললেন, তোর বয়সে আমিও অমনি ছিলাম রে, ঝগড়া-মারামারি অনেক ক'রেছি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখলাম, ওর ভেতর একটুও মজা নেই।

কথা বলতে বলতে তিনি বেরিয়ে পড়লেন বাড়ী থেকে।

চৌধুরীদের বাড়ীতে পৌঁছে ডাকাডাকি করতেই কালু যেন তেড়ে মারতে এলো একেবারে: তুমি কোত্থেকে ? মজা দেখতে এলে নাকি ?

রায় জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে বলছো ?

কালু খেঁকিয়ে উঠলো, তোমাকেই বলছি, আবার কাকে বলবো! বুড়ো হ'য়ে মরতে বসেছ, এখনও মজা দেখবার ইচ্ছেটি তো যায় নি। আজ চৌধুরী-বাড়ীর দরজায় এলে যে বড় ? দেব নাকি একটি চড় কসিয়ে।

রায় দেখলেন, অশ্বিনী ঠিকই বলেছিল। এ শুধু বাড়ী ব'য়ে অপমান

হ'তে আসা ছাড়া আর কিছু নয়। ভবানীর শালা তাঁকে দূর-দূর করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে।

যাবার সময় রায় চেঁচিয়ে বলে গেলেন, ওরে কে আছিস্, চৌধুরীকে ব'লে দিস আমি এসেছিলাম।

চেঁচামেচি শুনে মহামায়া ততক্ষণে দোতলার জানলায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি দেখলেন রায় ফিরে যাচ্ছেন আর কালু তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে বাইরের ফটক পর্য্যন্ত। কালুর শেষ কথা কানে এলো মহামায়ার : যাও, আর যেন কোনদিন এ-রাস্তা মাড়িয়ো না।

মহামায়া ডাকলেন, কালু! কালু! উনি চলে গেলেন কেন?

ফটকের কাছ থেকেই কালু চীৎকার করে জবাব দিলে, বুড়োর ভীমরতি ধরেছে। মজা দেখতে এসেছিল, দিলাম তাড়িয়ে।

কিছু না জেনে শুনে কালু বড়ো রায়কে তাড়িয়ে দিলে! যাতে এখনও তাঁকে ফিরিয়ে আনা যায়, সেইজন্যেই মহামায়া তাড়াতাড়ি নীচে যাচ্ছিলেন কাউকে দিয়ে তাঁকে ডাকতে পাঠাতে। কিন্তু যাবার মুখেই তিনি শুনলেন কর্ত্তার ঘর থেকে বিজয় তাঁকে ডাকছে। ডাক শুনেই বুকটা যেন ছাঁৎ ক'রে উঠলো তাঁর।

কাছে যেতেই বিজয় বললে, এই ছাখো, বাবা আর কথা বলছে না।

বাবা-বাবা ব'লে ডাকতে লাগল বিজয়, স্বামীর বুকের ওপর লুটিয়ে পড়লেন মহামায়া। আর্ত্তনাদ করে বললেন, কথা কও, ওগো কথা কও। চুপ ক'রে থাকতে বলেছি বলে কি একেবারেই চুপ ক'রে গেলে তুমি? একটি কথাও কি আর বলবে না?

কিন্তু সাড়া যিনি দেবেন, তিনি তখন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তাঁর পরম আদরের স্ত্রী-পুত্রের দিকে—হৃদ্‌পিণ্ডের শেষ স্পন্দনও থেমে গেছে তাঁর।

ভবানী চৌধুরীর মৃত্যুর পর পনেরো বছর কেটে গেল। চৌধুরীর

ছেলে বিজয় এখন বড়ো হ'য়েছে, ডাক্তারী পাশ করেছে। পাড়া-প্রতিবেশীর চিকিৎসা করবার জন্যে গ্রামের বাড়ীতেই সে ডাক্তারখানা খুলে বসেছে। ভালো ডাক্তার ব'লে নামডাকও তার কম হয়নি। অনেক দূর থেকেও রুগী দেখতে যাবার জন্যে ডাক আসে তার।

সেদিনও এক সাঁওতাল কুলি তাকে ডাকতে এলো: তুথে একবার যেতে হবেক বাবু আমার সঙ্গে।

জিজ্ঞেস করে বিজয় জানলো যে কুলিটা রায়েদের কলিয়ারীতে কাজ করে। কলিয়ারীর মাইনে-করা ডাক্তার আছে, তা'সত্ত্বেও বিজয়কে কেন সে ডাকতে এলো বিজয় ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

কুলিটা বলে, আমাদের ডাক্তারের কথা আর বলিস না বাবু, উ আসে না।

বিজয় অবাক হয়ে যায়। বলে, সে কি রে? তোদের কলিয়ারীর ডাক্তারবাবু যে আমার চেয়ে অনেক বড় ডাক্তার, খুব ভালো ডাক্তার।

কুলিটা বলে, হঁ, ভালো রইছে! ছ' ছটা রুগী পট পট ক'রে ম'রে গেল আমাদের ধাওড়াতে, কিছুই করতে লারলেক্, ভালো করে' ওষুধই দিলেক্ নাই। উর কথা বাদ দে। তুঁই চল্ আমার সঙ্গে, তুথে আমি ভিজিট দিব।

বিজয় বললে, ভিজিট আমি তোদের মত লোকের কাছ থেকে নিই না। চল্—আগে তোদের ডাক্তারের কাছেই যাই একবার।

কলিয়ারীর ডাক্তার মদেই ডুবে থাকে দিনরাত। ছেঁড়া সার্ট, ময়লা প্যাণ্ট, একমাথা উস্কোখুস্কো চুল আর একগাল দাড়িতে পাগলের মতই চেহারা হ'য়েছে তার। নিজের খাওয়া-দাওয়া কিম্বা কাজকর্ম্মের দিকে কোন ভ্রূক্ষেপই তার নেই। ঘরখানা যেন তার নরক কুণ্ড! বইপত্তর এলোমেলো ছড়ানো, এঁটো ভাতের থালায় মাছি ভন্ ভন্ করছে, বোতলের পর বোতল নির্জ্জলা মদই খেয়ে চলেছে সে।

বিজয় এসে তাঁকে ডাক্তারবাবু বলে ডাকতেই ঘরের ভেতর থেকে চীৎকার করে উঠ্‌লো সেঃ আঃ! হাজার বার বললুম বাইরের দোরটা বন্ধ ক'রে দে—আমাকে বিরক্ত করিস্ নে—করিস্ নে, তা না—ডাক্তার-বাবু! আমি ডাক্তার নই—বাবা, আমি ডাক্তার নই, মানুষ নই, আমি কিচ্ছু নই। বেরোও সব, দূর হও এখান থেকে।

নিজেই উঠে সে দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিল। হঠাৎ মুখ তুলেই দেখে বিজয় এসেছে—ভবানী চৌধুরীর ছেলে বিজয়। বিজয়কে দেখেই সমস্ত বিরক্তি কেটে গেল ডাক্তারের। হাসতে হাসতে সে বললে, আরে বিজয় যে! এসো-এসো-এসো; কী খবর?

বিজয় বললে, আপনার কলিয়ারী থেকে একজন সাঁওতাল আমাকে ডাকতে গিয়েছিল।

ডাক্তার একটু চিন্তিতভাবে বললে, হুঁ, খুব টাইফয়েড হ'চ্ছে। কতগুলো মরবে।

বিজয় জিজ্ঞেস করলো, তা' আপনি দেখতে যান না কেন?

ডাক্তার বললে, কেন-টেন জানি না, আমি যাই না,—বাস্! অনেক দিন পরে এলে, এসো একটু গল্প করা যাক।

বিজয় বললে, না, আমি যাই, রুগীটা দেখে আসি।

ডাক্তার বিরক্ত হয়ে বললে, যাবে? কী জন্যে যাবে? ওষুধ দিয়ে রুগী বাঁচাবে? পারবে বাঁচাতে?

বিজয় বললে, পারি না পারি, একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ কী?

ঢক ঢক ক'রে খানিকটা মদ গলায় ঢেলে ডাক্তার বললে, যদি মরবার হয়, তোমার হাজার চেষ্টাতেও সে বাঁচবে না, আর যদি বাঁচবার হয়, তোমার ওষুধ না খেলেও সে বাঁচবে।

ডাক্তারকে মদ খেতে দেখে বিজয় বললে, শুনছি, আপনি নাকি আজ-

কাল দিনরাত—বিজয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ডাক্তার বললে, হ্যাঁ, দিনরাতই খাই। শুধু ওই ঘুমোবার সময়টা বাদ থাকে।

বিজয় কী একটা কথা বলতে গিয়ে চুপ ক'রে গেল। ডাক্তার হেসে বললে, থামলে কেন? বল। বল—দিনরাত খাওয়া ভাল নয়' ওরকম করে খাবেন না, খে'লে লিভার-য়্যাব্‌সেস্ হবে, মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে, ফট্‌ ক'রে কোনদিন ম'রে যাবেন।—এই তো?

বিজয় মাথা নেড়ে বললে—হ্যাঁ।

ডাক্তার বিজ্ঞের হাসি হেসে বললে, আমি এসব জানিনা, না? —জানি। তোমার চেয়ে হয়তো বা কিছু বেশিই জানি। জানি; তবু খাই। কেন খাই এইটিই শুধু জানি না।

পাগলের সঙ্গে বক্ বক্ ক'রে কিছু লাভ নেই দেখে বিজয় চলে যাচ্ছিল। ডাক্তার পিছু ডাকায় আবার তাকে ফিরতে হোল।

কাছে আস্‌তে বিজয়কে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা বিজয়, কিছুদিন থেকে শুনছি, লোকে নাকি আমাকে পাগল বলছে। আমার কথাবার্ত্তা শুনে আমাকে কি তোমার পাগল ব'লে মনে হোল?

বিজয় একথার কী জবাব দেবে! সে আশ্বাস দিয়ে বললে, না-না, মাথা আপনার ঠিক আছে।

বিজয়ের কাছে মাথা ঠিক আছে শুনে আবার স্থরু হোল ডাক্তারের-বক্তৃতা:

দ্যাখো বিজয়, কিছুদিন থেকে এই পৃথিবী সম্বন্ধে আমার ধারণাটা কেমন যেন একটুখানি বদলে গেছে।—এই যে আমি, তুমি, এ-গ্রামের জমিদার প্রতাপ রায়, অশ্বিনী রায়—এরা এ পৃথিবী তো চালাচ্ছে না, চালাচ্ছে এমন একটা শক্তি—যার ওপর আমাদের কারও কোনও হাত নেই।

বিজয় হেসে বললে এ আর নতুন কথা কী? এসব আধ্যাত্মিক আলোচনা তো আমাদের দেশের ছোট ছেলেটি পর্য্যন্ত জানে

আবেগ-কম্পিত গলায় ডাক্তার ব'লে চললো, জানে—কিন্তু জেনেও তো কই সে বিরাট শক্তির কাছে কেউ আত্মসমর্পণ করে না! নিজের শক্তিরই বড়াই করে প্রত্যেকে। জানে না, আমরা কত দুর্ব্বল, কত অসহায়! আমার পরমাসুন্দরী স্ত্রীর মৃত্যু আমি নিজের চোখের ওপর দেখেছি। বিজয়, কী সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল তার! সামান্য একটু জ্বর হোল—ওষুধ দিলাম। এরকম কত রুগীকে আমি সারিয়েছি। ওষুধের পর ওষুধ দিলাম, তার জ্বর কিন্তু কিছুতেই সারলো না। দিনে দিনে বেড়েই চললো। তেরোদিনের দিন ঠিক এইখানটীতেই সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তারও জীবন অস্ত হ'য়ে গেল। পাঁচ বছরের ছেলে মুকুল—তার শিয়রের কাছটিতে চুপ করে বসে। একদিকে ছেলে, একদিকে আমি, কী যেন সে বলতে চাইলে, কিন্তু কিছুই তার বলা হোল না, চোখ দিয়ে শুধু দরদর ক'রে জল গড়িয়ে এলো। বাস্, তার পরেই সব শেষ!

বলতে বলতে নিতান্ত অসহায়ের মতো ডাক্তার তার ভাঙা খাটিয়াটার ওপর ধপ্ ক'রে ব'সে পড়লো। তার বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসে এক মুহূর্ত্তেই যেন ভারী হ'য়ে উঠ্‌লো ঘরের আবহাওয়াটা।

এই করুণ দুঃখের কাহিনী শুনে বিজয়ও একটু বিচলিত না হ'য়ে পারলো না। সেও দীর্ঘশ্বাস চেপে বললে, জানি আমি, সবই শুনেছি।

বিজয়ের কথা শুনে ডাক্তারের বুকের আগুন আবার যেন দাউ-দাউ করে জ্ব'লে উঠ্‌লো। আবার সে বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলতে লাগলো, জানো তুমি? আমার সেই একটিমাত্র ছেলে মুকুল, ফুলের মতন পবিত্র, ফুলের মতনই সুন্দর! মা-কে ছেড়ে সাতটি দিনও সে আমার কাছে রইল না! তারও হোল, সেই একই অসুখ। রাতের পর রাত জেগে ব'সে রইলুম তার শিয়রের কাছে, ডাক্তারী বিদ্যে আমার যতদূর জানা ছিল, চেষ্টার ত্রুটী করলুম না। ওষুধ দিলুম, ইঞ্জেকসন দিলুম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল

না, কোন ওষুধই তাকে বাঁচাতে পারলে না। আঘাতের পর আঘাত পেয়ে মনের জোর আমার ভেঙে চূরমার হ'য়ে গেছে। এখন শুধু ইচ্ছে করে ভাগ্যটাকে ছুঁড়ে ফেলে দি' জাহান্নামের পথে আর অভিসম্পাত দি' সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানকে।

উত্তেজনায় আত্মহারা হ'য়ে পড়েছিল ডাক্তার। হঠাৎ তার চৈতন্য হোল, এসবকথা বিজয়কে শোনাবার নয়। তার একার দুঃখ একার থাকাই ভালো। নিজেকে কোনমতে সাম্‌লে নিয়ে সে বিজয়কে বললে, কী সব মাথামুণ্ডু বকছিলাম এতক্ষণ ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না; বিজয়, তোমার দেরী হয়ে যাচ্ছে, তুমি যাও—ভালো ক'রে রুগী ছাখো গে, যাও।

কুলি-ধাওড়ায় এসে ভালো করেই রুগীকে পরীক্ষা ক'রে দেখতে লাগলো বিজয়। দশ-বারো বছরের লিক্‌লিকে চেহারার একটা কালো ছেলে, রোগে ভুগে' ভুগে' অবস্থা তার প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে।

কুলিটা কাকুতি ক'রতে লাগলো, ভালো ক'রে ছাখ্ বাবু। আমার ওই একটি ছেলে, উয়াকে বাঁচাই দে বাবু, তুঁই যা বলবি তাই করব।

বিজয় বললে, তাতো করবি, কিন্তু তোদের এই ধাওড়ার আশে পাশে ময়লাজলের যে গর্ত্তগুলো দেখে এলাম, ওগুলো পরিষ্কার করতে পারিস না?

কুলিটা বললে, কখন করব বাবু, দিনরাত আমরা তো খাদেই কাজ করছি।

বিজয় বললে, তোদের মনিবকে বলতে পারিস না? অশ্বিনীরায়কে?

অশ্বিনীরায়ের নাম শুনেই আঁতকে উঠলো কুলিটা। বললে, ওরে বাবা, বলতে গেলে তেড়ে মারতে আসে।

বিজয় বললে, কিন্তু ওগুলো যতদিন থাকবে, ততদিন এরকম অসুখ বিসুখের হাত থেকেও তো নিস্তার নেই তোদের।

আরেকজন কুলি মুখ তুলে বললে, এই অসুখে আমারও একটা ছেলে

মরে গেইছে বাবু, বলিস তো 'ডিনামাটি' দিয়ে ওই সব নর্দ্দামা-টর্দ্দমা উড়োঁই দিই।

বিজয় জিজ্ঞাসা করলো, তুই বুঝি ডিনামাইটের কাজ করিস?

কুলিটা জবাব দিলে, হুঁ বাবু, আমরা পিলার বেলাষ্টের কাজ করি।

বিজয় আবার প্রশ্ন করলে, তা ডিনামাইট কাটাতে গিয়ে যদি ধরা পড়িস, কী বলবি?

কুলিটা'র মুখে আর রা নেই, ধীরে ধীরে সে মাথা হেঁট করলো।

বিজয় বুঝলো অশ্বিনী রায় এমনই কড়া মনিব যে এসব কথা ঘুণাক্ষরে টের পেলে আর রক্ষা নেই কা'রো।

হাতে হাতে ওষুধ পাঠিয়ে দেবার জন্যে ছেলেটার বাপকে সঙ্গে নিয়ে বিজয় তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে চললো।

কুলি-ধাওড়া পেরিয়ে এসে কলিয়ারীর ইঞ্জিনঘরের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল বিজয় আর কুলিটা। ঠিক সেই সময়েই লিফ্‌টে করে পিটের মুখে এসে উঠলো অশ্বিনী রায়। বিজয়কে দেখে দূর থেকেই হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলো সে: এই! এই বিজয়!

বিজয় কে-ডাকছে দেখবার আগেই চক্ষের নিমেষে সঙ্গের কুলিটা দৌড়ে পালালো। অশ্বিনী রায় এগিয়ে এলো। বিজয়ের আপাদমস্তক একবার শ্যেনদৃষ্টিতে দেখে নিয়ে সে সরাসরি জেরা স্থরু করলো, বলি, এদিক দিয়ে আবার কবে থেকে হাঁটাহাটি স্থরু ক'রেছ?

বিজয় জবাব দিলে, এদিক দিয়ে বড় একটা আসবার দরকার হয় না, আজই এসেছিলাম।

—কেন এসেছিলে?

—আপনার কলিয়ারীর একজন-সর্দ্দার ডাকতে গিয়েছিল।

—কেন?

—তার ছেলের টাইফয়েড হ'য়েছে।

—কোথায় সে ?

—আপনাকে দেখে পালালো।

—আমার কলিয়ারীর ডাক্তার আছে, বোধ হয় জানো ?

—জানি।

—তবু তুমি এলে কেন ?

—আসতে চাই নি, লোকটা নেহাৎ ছাড়লে না, তাই এলাম।

চৌধুরী-বাড়ীর ছেলে এসে রায়েদের বিধিব্যবস্থার ভেতর নাক গলাবে এটা অশ্বিনীরায়ের চক্ষুশূল। বিজয়ের কথা শুনে আত্মসম্মানে ঘা লাগলো তাঁর। নিজের মনেই সে বলে উঠলো, ব্যাটারা কেন যে এরকম করে বুঝতে পারি না, তাদের সুখ-সুবিধার সব ব্যবস্থাই তো ক'রে দিয়েছি।

বিজয়ও মুখফোঁড় কম নয়। ঘাড় নেড়ে সে বললে, হ্যাঁ তা করেছেন বটে! মদের ভাঁটি, গাঁজা আফিংএর দোকান—সবই আছে। এইবার দয়া ক'রে ওই যে ধাওড়ার আশেপাশে ময়লাজলের গর্ত্তগুলো ক'রে দিয়েছেন ওইগুলো যদি পরিষ্কার করিয়ে দেন তো বড় ভাল হয়।

অশ্বিনী ভ্রূকুটি ক'রে জিজ্ঞেস করলো, কার ভালো হয় ? তোমার ?

বিজয় বললে, আজ্ঞে না। জানোয়ারের মত যারা আপনার ওই সব কুলি-ধাওড়ায় বাস করে, যাদের না হ'লে আপনার একদিন চলে না, কলিয়ারী বন্ধ হ'য়ে যায়—তাদের।

কুলি-মজুরদের ওপর এতটা দরদ সন্দেহজনক বলে মনে হয় অশ্বিনীর। বিদ্রূপ ক'রে সে বললে, বেশ বুলি শিখেছ তো ? এইসব ওদের শিখিয়ে এলে বুঝি ?

বিজয় জবাব দিলে, আজ্ঞে না।

কিন্তু আজ্ঞে-না বললে শুনছে কে ? অশ্বিনীর মেজাজ তখন গরম হ'য়ে গেছে। চোখ রাঙিয়ে সে বিজয়কে শাসিয়ে দিলে, খবরদার বলছি এরকম ক'রে আমার পেছনে লেগো না, ভাল হবে না।

মিছামিছি অশ্বিনীর মাথা-গরম করা দেখে হেসে ফেললে বিজয়। রহস্য করে বললে, আজ্ঞে না, কা'রও পেছনে লাগার অভ্যেস আমার নেই, লাগতে হ'লে সাম্‌নাসাম্‌নি লাগি।

অশ্বিনী পুরানো ইতিহাসের জের টেনে বললে, আমাদের সঙ্গে লাগতে গিয়েই তোমাদের এই দুরবস্থা, জানো তো ?

বিজয় বললে, আজ্ঞে না, আমাদের দুরবস্থার কারণ—আমার মামা। কিন্তু সে সব কথা তুলে আমি এখন সময় নষ্ট করতে চাই না। আমার হাতে অনেক রুগী রয়েছে, আমি চল্‌লুম।

একটা শুষ্ক নমস্কার জানিয়ে চ'লে যাচ্ছিল বিজয়। হঠাৎ তার কানে এলো অশ্বিনীরায়ের কথা : হ্যাঁ যাও। ভবিষ্যতে এদিক দিয়ে তুমি আর না এলেই ভালো হয়।

কথাটা শুনেই ঘুরে দাঁড়াতে হোল বিজয়কে। একটুও ইতস্ততঃ না ক'রে পাল্টা জবাব দিলে সে, ময়লাজলের গর্তগুলো যদি আপনি বন্ধ ক'রে দেন তো আরো ভালো হয়।

অশ্বিনী বাড়ী যাবার জন্যে মোটরে উঠে বসেছিল। গাড়ীর য়্যাক্‌সিলারেটরটা পায়ে চেপে ধ'রে সে বললে, আমার কিসে ভাল হয় না-হয় তা আমি বেশ ভালো ক'রেই জানি। তোমার কাছে পরামর্শ নেবার দরকার হবে না। তুমি যেখানে যাচ্ছ, যাও।

গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল অশ্বিনী। একটু হেসে বিজয়ও ফিরে চললো তার বাড়ীর দিকে।

সাঁওতাল কুলিটা আগেভাগেই বিজয়ের বাড়ীতে এসে বিজয়ের জন্যে অপেক্ষা করছিল। বিজয় না এলে তো আর ওষুধের ব্যবস্থা হ'তে পারে না। নায়েব বনমালীর ওপর কম্পাউণ্ডারীর ভার। সে তাই তাগিদ দিচ্ছিল কুলিটাকে : দ্যাখ না একবার বাইরে গিয়ে, বাবু আসছে কিনা ?

বাইরে আর যেতে হোল না কুলিটাকে। হন্তদন্ত হ'য়ে বিজয় এসে

ঘরে ঢুকলো। অনেক দেরী হ'য়ে গেছে দেখে তাড়াতাড়ি ওষুধের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনটা ক'রে দিল বনমালীকে। কুলিকে জিজ্ঞেস করলো, এই রকম লুকিয়ে লুকিয়ে কতদিন তুই ওষুধ নিয়ে যাবি ?

ছেলের জন্যে কিছু করতেই আর ভয়ডর ছিল না কুলিটার। সে বললে, রোজই নিয়ে যাব, বাবু। তুঁ আমার ছেলেটাকে বাঁচাই দে!

যে-ক'রেই হোক ছেলেটাকে যে বাঁচাতেই হবে, বিজয়ও মনে মনে সেই সঙ্কল্পই করেছিল। কলিয়ারীর ডাক্তারের নৈরাশ্য আর গরীবের দুঃখে অশ্বিনী রায়ের উদাসীনতা দেখে রোগ সারাবার জন্যে রোখ্‌ চেপে গিয়েছিল বিজয়ের। নাওয়া-খাওয়া ভুলে সে কুলি-ছেলেটার পরিচর্য্যায় লেগে গেল। শুধু প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌ করা নয়, ওষুধ-পথ্যি খাওয়ানো থেকে সুরু ক'রে সেবাশুশ্রূষার সমস্ত কাজই সে নিজের হাতে তুলে নিল। চিকিৎসা তো নয়, ক'দিন ধ'রে যেন যমে-মানুষে টানাটানি চললো ছেলেটাকে নিয়ে। রোগ যতো বেড়ে যায়, বনমালীও তত কাঁটায় কাঁটায় ওজন করে ওষুধ তৈরী করে। মিক্‌শ্চারের অনুপাত যাতে এক ফোঁটা কম-বেশী না হয় তার জন্যে সে কি তার প্রাণপণ চেষ্টা! সমস্ত চেষ্টাই কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হ'য়ে গেল। গলা দিয়ে আর ওষুধ নামলো না ছেলেটার, মুখের পাশ দিয়ে সমস্ত ওষুধ গড়িয়ে পড়লো মাটীতে। দেখতে দেখতে সব শেষ হ'য়ে গেল দেখে কুলি-সর্দ্দার কেঁদে উঠলো হাউ-হাউ করে।

কলিয়ারীর ডাক্তার কিন্তু ছেলেটার মৃত্যু-সংবাদ শুনে একটুও দুঃখিত হোলো না। এমন যে হবে তা' সে আগেই জানতো। পাগলের মতন সে তাই হেসে উঠলো হো-হো ক'রে। হাসতে হাসতে সে বিজয়কে বললে, পারলে ? পারলে বাঁচাতে ? চেষ্টার তো ত্রুটী কর নি।

পরাজয়ের লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল বিজয়। ডাক্তারের কথায় মাথা তুলে সে বললে, রুগীকে বাঁচাতে পারলুম না, তবে এ রোগ যাতে আর না হয়, এবার আমি সেই চেষ্টাই করবো।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলো, কেমন ক'রে?

বিজয় বললে, ময়লা জল যেখানে জমে সে-জায়গাগুলো ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে-দেবো। রোগের ব্যাসিলি আর তাহ'লে জন্মাতে পারবে না।

এই ধরণের একটা মতলব বোধ হয় ডাক্তারের মনে মনে ছিল। বিজয়ের কথায় তাই সে খুব উৎসাহিত হ'য়ে বললে, ভালো। এ যদি ক'রতে পার তো খুবই ভালো হয়।

কথাটা ডাক্তারেরও মনে ধ'রেছে দেখে, বিজয় তাড়াতাড়ি সব যোগাড়-যন্তর করতে লেগে গেল।

ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়। পিলার ব্লাষ্টিংএর কুলি মানা-সর্দ্দারকে অনেক কষ্টে সবার নজর এড়িয়ে একটা ডিনামাইট হাত-সাফাই করতে হোল। চুপি চুপি বিজয়ের হাতে ডিনামাইট দিয়ে সে বললে, এই লে বাবু, ডিনামাইটি একটো চুরি করে এনেছি।

মানা-সর্দ্দারের ভয় ছিল, মনিব জানতে পারলে জেল খাটিয়ে দেবে। অই বিজয়ের হাতে ডিনামাইট গছিয়ে দিয়ে সে পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু পিছন ফিরতেই সে একেবারে মুখোমুখি প'ড়ে গেল খাদ-সরকারের। খাদ-সরকার এসে খপ্ করে তার হাত চেপে ধ'রে জিজ্ঞেস করলো, কা'র সঙ্গে কথা বলছিলি রে?

মানা-সর্দ্দার ভয়ে ভয়ে বললে, বিজয় ডাক্তারের সঙ্গে।

সরকার জিজ্ঞেস করলো, কী বলছিলি?

মুখ কাঁচুমাচু ক'রে মানা বললে, কিছুই না তো।

কিন্তু মানা-সর্দ্দার অস্বীকার করলে কী হবে, সরকার নিজের কানে শুনেছে যে বিজয়ের সঙ্গে তার ডিনামাইট নিয়ে কী কথা হচ্ছিল।

মানাকে ছেড়ে দিয়ে সে তাই তাড়াতাড়ি অশ্বিনী রায়কে খবরটা জানাতে ছুটলো।

অশ্বিনী রায়ের বাড়ীতে গিয়ে সে জানালো, তাজ্জব কাণ্ড হুজুর।

যাচ্ছিলাম তেলগুদোমের দিকে, দেখি কি না—ওই বিজয় ছোঁড়াটা মানা-সর্দ্দারের সঙ্গে ফুসুর-ফুসুর গুজুর-গুজুর করছে। ডিনামাইটের কথা কাণে যেতেই আমি আর থাকতে লারলাম, পা টিপে টিপে 'ফলো' ক'রে দেখলাম কী যেন একটা বিজয়ের হাতে দিলে মানা-সর্দ্দার।

অশ্বিনী রায় হুকুম দিলে, ডাকো মানা-সর্দ্দারকে, আমি ব্যাটাকে একেবারে জন্মের মতো শায়েস্তা ক'রে দিই।

সরকার বললে, আপনাকে কিছু করতে হবে না হুজুর। আপনার দু'জন চাপরাশী আমার সঙ্গে দিন—আমি আসামীকে একেবারে 'রেড হ্যাণ্ড্ কট্' ক'রে আপনার কাছে হাজির করে দিচ্ছি।

অশ্বিনী জিজ্ঞেস করলো, কাকে পাকড়াও ক'রবে? মানা-সর্দ্দারকে?

সরকার মাথা নেড়ে বললে, মানা-সর্দ্দার কেন হবে? বিজয়!—বিজয়কে।

অশ্বিনী দেখলো, সরকারের বুদ্ধিই ঠিক। বিজয়ই যখন যতো নষ্টের গোড়া, তখন তাকেই একটু ভালোরকম শিক্ষা দেওয়া দরকার! বিজয়কে হাতে-নাতে ধ'রে ফেলবার জন্যে চার-পাঁচজন লোক সে বন্দোবস্ত ক'রে দিল সরকারের সঙ্গে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা ডিনামাইট ফাটাতে আসবার কথা ছিল বিজয়ের। মানা-সর্দ্দার তাই আগে থেকেই এসে পথে দাঁড়িয়ে ছিল বিজয়কে সাবধান ক'রে দেবার জন্যে। শাবল আর ডিনামাইট হাতে বিজয়কে আসতে দেখে সে বললে, তু যাস্ না বাবু। খাদ-সরকার কাল আমাদের দেখে ফেলেছে।

কিন্তু দুঃসাহসে আর গায়ের জোরে কা'রো কাছে হার মানবার পাত্র বিজয় নয়। সে বললে, দেখুক না। কী করবে? যাব যখন বলেছি, তখন আমি যাবই।

জলকাদা ভেঙে নির্ভয়ে এগিয়ে চললো বিজয়। মানা-সর্দার তার সঙ্গে আসতে চাইলো, কিন্তু কিছুতেই সে তাকে আসতে দিল না।

জলা-জমির মাঝামাঝি একটা সুবিধে মত জায়গা বেছে নিয়ে শাবল দিয়ে গর্ত্ত করতে সুরু করলো বিজয়! সন্ধ্যার আবছায়াতে ছম্ ছম্ করছে চারিদিক। এ-সময়ে এদিকে কা'রও আসবার কথা নয়, আর এলেও সহজে কেউ দেখতে পাবে না বিজয়কে। গুঁড়ি মেরে ব'সে বিজয় একমনে তার কাজ সারছিল। আড়াআড়ি একটা গর্ত্ত ক'রে তার মধ্যে ডিনামাইটটাকে মাটী চাপা দিয়ে রেখে যেই সে আগুন লাগাবে ব'লে প'লতেটা হাতে নিয়েছে অমনি হৈ-হৈ করতে করতে অশ্বিনী রায়ের লোকজন এসে চড়াও হলো তার ওপরে। বাঁধের ওপাশে ঝোপেঝাড়ের আড়ালে তারা এতক্ষণ ওৎ পেতে বসেছিল। সকলের শেষে ছুটতে ছুটতে এলো দলের পাণ্ডা খাদ-সরকার। বিজয়কে দেখে সে যেন আকাশ থেকে পড়লো একেবারে। ভয়ানক আশ্চর্য্য হবার ভাণ ক'রে সে বললে, আরে বিজয় বাবু যে! এখানে, এমন অসময়ে? ব্যাপার কী বটে?

ঘাবড়াবার ছেলে বিজয় নয়। বাঁ-হাতে প'লতের মুখটা চেপে ধ'রে সে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললে, ব্যাপার কিছুই নয়। এদিকে কেউ আসে না, তাই একবার জায়গাটা দেখতে এলাম।

সরকার বললে, কিন্তু বাবুর হুকুম, বাবুর সঙ্গেও যে আপনাকে দেখা করতে হবেক আজ্ঞা। আপনাকে তো ছাড়া হবেক নাই।

ব'লতে ব'লতেই চাপরাশিরা টানাটানি সুরু করলো বিজয়কে ধ'রে। বিজয় বললে, পাকড়াও করতে হবে না। চলো কোথায় যেতে হবে।

ব'লেই পকেট থেকে সিগারেট বে'র ক'রে সে খাদ-সরকারকে একটা দিলে: নাও, সিগারেট খাও একটা।

বিজয়ই দেশলাই জ্বেলে সরকারের সিগারেটটা ধরিয়ে দিলে। নিজের

সিগারেটটাও ধরিয়ে নিয়ে সে জলন্ত কাঠিটা ফেলে দেবার সময় আগুন লাগিয়ে নিলে বাঁ-হাতের প'লতেটার মুখে। তারপর নিতান্ত ভালো-মানুষটীর মত বললে, বাস্, আমার কাজ হ'য়ে গেছে, এবার চলো।

তারাও এগিয়ে চললো, এদিকে আগুনের ফুলকি ছাড়াতে ছাড়াতে পলতেটাও পুড়তে পুড়তে এগিয়ে চললো। কিছুদূর যেতেই হঠাৎ আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে একটা প্রচণ্ড আওয়াজ হোল ডিনামাইট ফাটবার। সবাই পিছন ফিরে দেখলো, ধোঁয়ায় আকাশ অন্ধকার হ'য়ে গেছে।

খাদ-সরকার বিজয়ের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, আচ্ছা সর্ব্বনাশা লোক তো দেখছি আপনি!

হাসতে হাসতে বিজয় বললে, সর্ব্বনাশটা দেখলে কোথায়? এতে তোমাদের কী উপকার হোল তা' এখন না বুঝলেও, পরে বুঝতে পারবে।

বিজয়কে খাদ-সরকার কতক্ষণে পাকড়াও ক'রে নিয়ে আসে, দোতলার ঘরে বসে তারি জন্যে অপেক্ষা করছিল অশ্বিনী। খাদ-সরকার এসে বাবু-বাবু ব'লে ডাকতেই সে একটা জামা গায়ে চড়িয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে যাচ্ছিল। অশ্বিনীর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যাচ্ছ?

অশ্বিনী যেতে যেতে বললে, সবই কি তোমাকে বলতে হবে নাকি? দরকার আছে, তাই যাচ্ছি।

অশ্বিনী সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল একতলায়। কেন জানি না। অশ্বিনীর স্ত্রীর মনে হোল তার স্বামীর মনে আবার কোন অশুভ বুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

তার অনুমান যে মিথ্যে নয় একটু পরে তার মেয়ে বিমলার কথাতেই তা' প্রমাণ হয়ে গেল। বিমলা এসে খবর দিলে, চৌধুরীদের বিজয়—তার ছোট বেলার বিজয়দা'কে ধ'রে নিয়ে এসেছে রায়েদের চাপরাশীরা। ব্যাপার কী হয় দেখবার জন্যে বিমলা ছুটলো নীচের তলায়। বিমলার ছোট ভাই কমলও দিদির কিছু পিছু মজা দেখতে যাচ্ছিল। মা তাকে

কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললে, তুই ছেলে মানুষ, তুই ওসব হাঙ্গামার ভেতর যাস্‌নে বাবা। ভয়ে আমার বুক দুর-দুর করছে। বেশ ছিল য়্যাদ্দিন, আবার তোর বাবা কী কাণ্ড করবে কে জানে?

দোষ যখন পাওয়া গেছে, সহজে ছেড়ে দেবার লোক অশ্বিনী রায় নয়। কুলি মজুরদের দুঃখকষ্টের কথা তুলে বিজয় যতোই তাকে তার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করবার চেষ্টা করছিল, সে ততই হাড়ে হাড়ে জ্বলে যাচ্ছিল বিজয়ের ওপর। রাগের মাথায় সে বললে, আমার ছাগল যদি আমি লেজের দিকে কাটি তাতে তোমার কী?

বিজয় বললে, যে-সব কুলি-মজুর আপানার কলিয়ারী চালায়, তারা ছাগল-ভেড়া হ'লে আমি কিছুই বলতাম না। তারাও ঠিক আপনার আমার মতই মানুষ।

অশ্বিনী দেখলো বিজয়ের ঘাড়েও সাম্যবাদের ভূত চেপেছে। মনে মনে প্রমাদ গণলে সে। মুখে বললে, ওই যে কী-সব ধুয়া তুলেছ আজকাল—কমিউনিজ্‌ম্‌ না ঘোড়ার ডিম—ওরা দুঃখী, ওরা গরীব, ওদের ওপর আমরা জুলুম করি—এই সব ব'লে ব'লে দাও ওদের ক্ষেপিয়ে, তারপর ওরা যেদিন আমাদের মাথায় চ'ড়ে আমাদেরই মুখের ওপর পটাপট জবাব দিয়ে দেবে সেইদিন বুঝবে মজা।

বিজয় বললে, ভুল করছেন আপনি। আমি কোন দলের লোক নই। আপনি যদি ওদের সুখ-সুবিধার কথা সত্যিই ভাবেন তো ওরাও কোনদিন বেইমানি করবে না।

অশ্বিনী ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে, না করবে না? কারবার তো কোনদিন কর নি ওদের সঙ্গে, তুমি কী ক'রে জানবে হে দু'দিনের ছোকরা? ছ্যাখো, মাথার ওপরে সূর্যির তাত্‌ সহ্য হয়, কিন্তু সেই তাতে পায়ের নীচের বালি যখন গরম হ'য়ে ওঠে, সে বালিতে আর পা দেওয়া যায় না।

বিজয়ের মত হুজুগে'মাতা ছেলে যে এসব কথা বুঝেও বুঝবে না তা

অশ্বিনীর জানতে বাকী ছিল না। তাছাড়া, বিজয়ের সঙ্গে রাজনীতি বা সমাজনীতি আলোচনা করবার জন্যে তাকে দরোয়ান দিয়ে ধ'রে আনায় নি অশ্বিনী। তাই তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা বদলে ফেললো অশ্বিনী: থাকগে ওসব কথা থাক, এখন যে অপরাধ তুমি করেছ তার কী কৈফিয়ৎ দেবে, দাও।

বিজয় জবাব দেয়, আমি অপরাধই করি নি। কৈফিয়ৎ কিসের?

—তুমি যা করেছ তা অপরাধ নয়?—অবাক হ'য়ে যায় অশ্বিনী বিজয়ের আস্পর্দ্ধা দেখে।

বিজয় বলে, না, মোটেই অপরাধ নয়।

অশ্বিনী শাসায়, জানো—এর জন্যে তোমাকে আমি জেল খাটাতে পারি।

বিজয়েরও মুখে ব'লতে আটকায় না: পয়সা থাকলে অনেক কুকাজই করা যায়। আপনার পয়সা আছে, আপনি সবই পারেন।

কথা-কাটাকাটির ঝোঁকে দুজনের গলাই ঝাঁঝালো হ'য়ে উঠতে লাগলো ক্রমে ক্রমে। অশ্বিনী জানতে চাইলো, বল তুমি ডিনামাইট কোথায় পেলে?

বিজয় বললে, সে কথা আপনি না-ই বা জানলেন। যেখান থেকে হোক পেয়েছি।

—শুধু পেয়েছি বললে চলবে না। কার কাছ থেকে পেয়েছ তোমাকে বলতে হবে।

—রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি।—বললে বিজয়।

অশ্বিনী ধমক দিয়ে বললে, রাস্তায় কুড়িয়ে পাবার জিনিষ ডিনামাইট নয়, বাজে বোকো না। বল কার কাছ থেকে পেয়েছ?

বিজয় জবাব দিলে, এর বেশি আর কিছুই আমি বলতে পারবো না।

—তার মানে? তুমি বলবে না কোথায় পেয়েছ?

—না।

—কিছুতেই বলবে না?

—আজ্ঞে না।

শেষবারের মত অশ্বিনী সাবধান ক'রে দিল বিজয়কে: দ্যাখো, তোমার বাবার মৃত্যুর পর থেকে চৌধুরীদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া-বিবাদ একরকম ছিল না বললেই হয়, তুমি তাকে আবার নতুন ক'রে খুঁচিয়ে তুলো না। বল, যা জিজ্ঞেস করছি।

বিজয়েরও একেবারে ধনুকভাঙা পণ: বলবো না।

—বলবে না?—দাঁতে দাঁত চেপে আবার জিজ্ঞেস করলো অশ্বিনী।

বিজয়ও আবার মুখ ফিরিয়ে জবাব দিলে—না।

অশ্বিনীরও ভীষণ জেদ চেপে গেল। সে ব'লে উঠলো, কেমন করে বলাতে হয় তা আমি জানি।

বিজয় বললে, বেশ তো, চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

ভুরু কুঁচকে অশ্বিনী বললে, তোমার সাহস তো কম নয়!

বিজয় একটু বিনয়ের হাসি হেসে বললে, আমার আর কিছু নেই, শুধু ওই সাহসটুকুই আছে।

অশ্বিনী বুঝলো, এ ছেলে ভাঙবে তবু মচকাবে না কিছুতেই। অশ্বিনী হাঁক দিল, শুকুল!

কাছেই ছিল খাদ-সরকার। সে এগিয়ে এসে বললে, আমি রইছি আজ্ঞা, আমাকেই বলেন না কী করতে হবেক?

অশ্বিনী আঙুল দিয়ে কোণের একটা ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললে, একে ওই ঘরের ভেতর বন্ধ ক'রে রাখো। আমি থানায় যাচ্ছি।

বিজয় বললে, বন্ধ ক'রে রাখবার কী দরকার? আমিও যেতে পারি আপনার সঙ্গে।

অশ্বিনী বললে, না তোমাকে আসতে হবে না। পুলিশ এসে তোমাকে হাত কড়া দিয়ে নিয়ে যাবে এখান থেকে।

ব'লতে ব'লতেই অশ্বিনী রায় বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে। খাদ-সরকার এসে বিজয়ের হাতখানা চেপে ধরতেই এক ঝাঁকুনী দিয়ে বিজয় হটিয়ে দিলে তাকে। বিরক্ত হয়ে বললে, থাম্‌রে বাবা 'থাম্‌, আমি চোর-ডাকাত নই। টানাটানি করতে গেলে পারবি না আমার সঙ্গে, চল, কোথায় যেতে হবে।

এক ঝট্‌কাতেই বিজয়ের গায়ের জোর মালুম হ'য়েছিল খাদ-সরকারের। সে আর উচ্চবাচ্য না ক'রে সামনের ছোট কুঠরীর দরজাটা খুলে দিল। বিজয় নিজে থেকেই ঢুকলো গিয়ে সেই ঘরের ভেতর। সরকার বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিচ্ছে দেখে বিজয় বললে, ভেতরে বড্ড অন্ধকার যে রে! একটা আলো দিয়ে যা।

কিন্তু কয়েদীকে আলো দিয়ে আপ্যায়িত করবে এমন দরদী কেউ সেখানে না থাকারই কথা। একজন অবিশ্যি থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল। পরের বাড়ীর ছেলের সঙ্গে এমন ক'রে দুর্ব্যবহার করাটা তার ভালো লাগছিল না মোটেই। খাদ-সরকার দরজা বন্ধ ক'রে চলে যেতেই থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো সে। সে বিমলা।

বিমলা ভাবলো, দোরটা এই সময় খুলে দিলে মন্দ হয় না। খানিকটা এগিয়েও গেল সে। কিন্তু এখন তো, আর সে বিজয়ের ছেলেবেলার খেলার সাথী সাত-আট বছরের কচি-খুকীটি নয়। বয়স্ক মেয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দরজা খুলছে দেখলে বিজয়দা'ই বা কী ভাববে তার? চক্ষুলজ্জার ভয়ে দরজা না খুলেই ফিরে যেতে হোল বিমলাকে।

বুড়ো ঠাকুরদা' নিজের ঘরে আরাম কেদারায় শুয়ে শুয়ে বই

পড়ছিলেন। তারই শরণাপন্ন হোল এসে বিমলা। হাঁপাতে হাঁপাতে সে এসে বল্‌লে, দাতু, দাতু, দেখবে এসো বাবা কী করলে!

অশ্বিনীর কার্য্যকলাপে তিক্তবিরক্ত হয়েই ছিলেন বৃদ্ধ প্রতাপ রায়। বৃদ্ধবয়সে আর নতুন কোন ঝঞ্ঝাট নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না। বিমলার কথা শুনে তিনি বললেন, তোমার বাবার কীর্ত্তি আমাকে তোমরা কেউ আর দেখতে বোলো না। ওর যা খুশী তাই করুক। তোমরা ভেবো—আমি ম'রে গেছি। যাও। আমাকে আর বিরক্ত কোরো না।

বিমলার দিকে চোখ না তুলেই বড় রায় যেমন বই পড়ছিলেন তেমনি নিজের মনে বই পড়ে যেতে লাগলেন। দাতু যে কথাটা না শুনেই এমন ক'রে খিটমিটিয়ে উঠবেন তা বিমলার ধারণার বাইরে ছিল। সে ভেবেছিল সমস্ত দেখেশুনে দাতু নিজেই বিজয়কে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা ক'রবেন! তাই বড় মুখ ক'রে সে দাতুকে ডাকতে এসেছিল। কিন্তু দাতুর কাছে প্রথমেই কতকগুলো কড়া কথা শুনে তার মুখে আর কথা যোগাল না। কী করবে ভেবে না পেয়ে সে চুপচাপ দাতুর সামনে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

খানিকক্ষণ বাদে মুখ থেকে বই নামাতে বড় রায় দেখলেন বিমলা এখনও কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে র'য়েছে। বল্‌লেন, এই নাও, মুখ ভার ক'রে দাঁড়িয়ে রইল! আমার কি আর এদের জন্য মরবার জো আছে। চল দেখি, তোমার বাবা আবার কী ফ্যাসাদ বাধালে দেখে আসি।

গায়ে আলোয়ানটা জড়াতে জড়াতে উঠে দাঁড়ালেন প্রতাপ রায়। এতক্ষণে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো বিমলার। দাতুর কাছে সে নালিশ জানালো:

বাবা আবার ঝগড়া লাগিয়েছে চৌধুরীদের সঙ্গে। দারোয়ান দিয়ে বিজয়দাকে ধ'রে এনে নীচের একটা অন্ধকার ঘরে আটকে রেখেছে। এখন নিজে গেছে থানায় পুলিশ ডাকতে।

—বিজয় করেছিল কী ? জিজ্ঞেস করলেন প্রতাপ রায়।

বিমলা বললে, আমি জানি না, তুমি ওকেই জিজ্ঞেস করবে চলো। কী-সব ডিনামাইট না-কি বলছিল আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না।

হাত ধ'রে হিড়-হিড় ক'রে দাদুকে টানতে টানতে চললো বিমলা। রায় যতো বলেন, আমি বুড়ো মানুষ—আমি কি তোর সঙ্গে ছুটতে পারি, বিমলা সেকথা গ্রাহ্যই করে না। তার মন তখন পড়ে আছে বিজয়দার কাছে। নীচের অন্ধকার ঘরে কত কষ্টই না হ'চ্ছে বিজয়দার! যাবার মুখে দাদুর লাঠিখানা দাদুর হাতে এগিয়ে দেয়, আর নিজে একটা টর্চ্চের আলো নিতেও ভোলে না সে।

নীচে কয়েদঘরের সামনে এসে বিমলা দাদুকে তাগিদ দেয়ঃ খোলোই না দরজাটা! খুলে ডাকো। ডাকলেই বেরিয়ে আসবে।

রায় ছিটকিনি খুলে দরজার ভেতর মুখ বাড়িয়ে ডাকেনঃ বিজয়! বিজয়! কা'রো কোন সাড়াশব্দ নেই ঘরের ভেতরে। রায় বললেন, ঠিক দেখেছিস্ তো ?

—হ্যাঁ, দেখেছি বৈকি ? জোর দিয়ে বললে বিমলা।

রায় একটু চিন্তিত ভাবে বললেন, দেখিস্ আবার! বয়েসটা খারাপ! এই বয়েসে একটু-আধটু দৃষ্টিবিভ্রমও হ'তে পারে।

বিমলা বুঝলো, দাদু ঠাট্টা করছেন তার সঙ্গে। লজ্জায় রাঙা হ'য়ে সে বললে, যাঃ ও! আমি দেখছি।

ঘরে ঢুকে চারিদিকে টর্চ্চ ফেলে ফেলে সে বিজয়দাকে খুঁজতে লাগলো। চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো—বিজয়দা! বিজয়দা!

হঠাৎ একটা জানালার ওপর টর্চ্চের আলো ফেলতেই তার মুখের ডাক মুখেই থেকে গেল! অবাক হ'য়ে সে দেখলো জানালার রড্ বাঁকানো। বিজয়দাই যে জানালা ভেঙে পালিয়েছে তা' বুঝতে আর বাকী রইল না

বিমলার। হাসতে হাসতে সে বাইরে বেরিয়ে এসে বললে, দাতু, দাত্ব বিজয়দা' পালিয়েছে।

—পালিয়েছে কীরে ?—দাত্ব তো শুনে অবাক।

বিমলা পরম উৎসাহে বলতে লাগলো, হ্যাঁ, ঠিক পালিয়েছে। দেখবে এসো জানালার রড্ বাঁকানো। বিজয়দার গায়ে কী-রকম জোর দেখেছ দাত্ব !

দাত্ব দেখলেন তাঁর নাত্নীটি বিজয়ের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠেছে। বাবা যাকে পুলিশে দিতে চায়' মেয়ে তার গায়ের জোর দেখে এতটা উল্লসিত হ'য়ে উঠবে এটা যেন বেশ একটু সন্দেহজনক ঠেকলো বুড়োর কাছে। পরিহাসটুকু চেপে তিনি বললেন, এত জোর কিন্তু ভালো নয়, দিদি।

—না—ভালো নয় ! মুখ ঘুরিয়ে বললে বিমলা, চোর-ডাকাতের মত তোমরা তাকে ঘরের ভেতর আট্‌কে রাখবে আর সে পালাবে না !

—পালাবে ?

—হ্যাঁ, পালাবেই তো !

—রায়েদের বাড়ী থেকে ?

—রায়েরা একেবারে লাট-বেলাট, না রাজা মহারাজা ? রায়েরা কী ?

ভুরুদুটো কপালে তুলে রায় বললেন, তুমি শত্রুপক্ষের হ'য়ে কথা বলছো দিদি। সাবধান।

বিমলা বললে, বয়ে গেছে আমার সাবধান হ'তে !

—তোমার বাবা যদি শোনে এই সব কথা—

—শুনুক গে—।

রায় বললেন, ভালো ভালো। তোমায় সাহস আছে দিদি। তুমি এসো তো আমার সঙ্গে।

বিমলা জিজ্ঞেস করলো,—কোথায় ?

—যেখানেই হোক, এসোই না। ব'লে বড়ো রায় বিমলার হাত ধ'রে টানতে টানতে তাকে বাড়ীর বাইরে নিয়ে চললেন।

বিমলাকে নিয়ে প্রতাপ রায় সরাসরি এসে হাজির হ'লেন বিজয়দের বাড়ীতে। বিজয়ের মা মহামায়ার সঙ্গে দেখা ক'রে, তিনি বললেন, এই মেয়েটি রায়েদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে মা, তাই আজ আমি ওকে চৌধুরীদের বাড়ীতে নিয়ে এলাম। পছন্দ হয় তো একে তুমি নিতে পার।

রায়-মহাশয়ের কথার ইঙ্গিত বুঝতে দেরী হোল না মহামায়ার। রায়ের প্রস্তাবে তাই সায় দিয়ে তিনি বললেন, রায় আর চৌধুরীদের বিবাদ-বিসম্বাদ যদি মিটিয়ে ফেলতে হয় তো এমনি একটা কিছু করতেই হবে!

রায় বললেন, মরবার আগে সেই ব্যবস্থাটাই ক'রে যেতে চাই।

মহামায়া বললেন, বিজয়ের বাবাও মরবার আগে ঠিক এইজন্যেই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

মহামায়া পাছে দোষ ধরেন তাই ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে রায় ব'ললেন, আমিও এসেছিলাম মা। কিন্তু তোমার সেই ভাইটা আমাকে সদর থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

ভাইয়ের জন্যে মহামায়াকেও কম দুর্ভোগ ভুগতে হয় নি। ভবানী চৌধুরীর মৃত্যুর পর নাবালক ভাগ্নের অভিভাবক সেজে এত বড় জমিদারীটা কালু লুটে পুটে খেয়েছে। এখন সম্পত্তি ব'লতে চৌধুরীদের বসতবাড়ী-খানা ছাড়া আর কিছুই সে রাখে নি। এমন কী, বিজয়কে ডাক্তারী পড়ানোর খরচ মহামায়াকে নিজের গায়ের গয়না বিক্রী করে যোগাতে হ'য়েছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি তাই বললেন, সেই ভাইয়ের জন্যেই আজ আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হ'য়েছে।

একথা বড় রায়ও জানতেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় সেটা, আর আসে এখানে?

—আর তো তার আসবার কোন দরকার নেই, বললেন মহামায়া।
—ভেবেছিলুম মার পেটের ভাই, আপনার লোক—

—ক্ষতি যে আপনার লোকেই বেশি করে মা! সমবেদনায় ভারী হ'য়ে উঠলো রায়ের কণ্ঠস্বর। একটু থেমে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বিজয় কোথায়?

মহামায়া বিজয়-বিজয় ব'লে ডাকতেই বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো বিজয়। প্রতাপ রায়কে দেখে অবাক হ'য়ে গেল সে: এ কি! আপনি!

রায় বললেন, হ্যাঁ, তোমাকেই খুঁজছি। ঘরের ভেতর তোমাকে আটকে রাখা হোল, তুমি জানলার শিক্ ভেঙ্গে পালিয়ে এলে যে!

—আপনাদের বাড়ীতে যা মশা! হাসতে হাসতে বললে বিজয়। এ.ক অন্ধকার, তার ওপর মশার কামড় সহ্য হোল না, তাই পালিয়ে এলাম।—

হঠাৎ তার নজর পড়লো বিমলার ওপর: একি! বিমলাও এসেছে দেখছি! রায় বললেন, বিমলা বলছে—এবার তোমাকে এমনভাবে আটকাতে হবে যে, হাজার মশায় কামড়ালেও যেন তুমি পালাতে না পারো।

বিমলার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বিজয় বললে, তা বাঁধন যদি শক্ত হয় তা'হলে নাও পালাতে পারি।

রায় বললেন, বেশ, কথাটা জানা রইল। আমরা এবার উঠি তাহলে। বিজয় তখনও বিমলার দিকে তাকিয়েছিল। বিমলার হাত ধ'রে রায় উঠে দাঁড়াতেই চমক ভাঙলো তার: হ্যাঁ তাড়াতাড়ি যান, আপনার ছেলে গেছে থানায়, দারোগা আসবে আসামীকে গ্রেপ্তার করতে।

বিমলাকে সঙ্গে নিয়ে রায় চলে গেলেন। যাবার মুখে কয়েকবার চোরা-চাউনিতে বিজয়কে দেখে নিতে ভুলল না বিমলা।

এদিকে অশ্বিনী ততক্ষণে দারোগা-কনেষ্টবল সঙ্গে নিয়ে বাড়ীতে এসে হাজির। কয়েদ-ঘরের সামনে সবাইকে নিয়ে এসে সে বললে, আসুন দারোগাবাবু আপনাকে এত কষ্ট দিয়ে নিয়ে এলাম শুধু আসামীকে হাতে-নাতে ধরিয়ে দেবো ব'লে। ডিনামাইটের মতন জিনিস মশাই— চুরি করে দিলে আগুন লাগিয়ে! খাদকে খাদ উড়িয়ে দেবার মতলব। এই ঘরের ভেতর ওকে জোর ক'রে আটকে রেখেছি। আসুন, আপনি নিজের হাতে—

হঠাৎ দরজার দিকে চোখ পড়লো অশ্বিনীর। একি, দরজা খোলা কেন? কে খুললে? শুকুল শুকুল ব'লে হাঁকাহাঁকি সুরু করলো অশ্বিনী।

হিন্দুস্থানী দরোয়ান শুকুল এসে সমস্ত দেখে-শুনে আম্‌তা আম্‌তা করতে লাগলো। কে যে দরজা খুলে দিয়েছে তা সে বিন্দু-বিসর্গও টের পায়নি।

অশ্বিনী ধম্‌কাতে লাগলো, কী জন্যে তোদের মাইনে দিয়ে রেখেছি বলতে পারিস্? আমার আসামী কোথায় গেল বল্ শীগ্‌গীর, নইলে—

কী আর করবে শুকুল? ঘরের ভেতর এদিক ওদিক ভালো করে খুঁজে-পেতে দেখলো ঘরে কেউ নেই। ফিরে এসে মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, ভাগ্‌ গয়া হুজুর।

আগুন হয়ে উঠলো অশ্বিনী: ভাগ্‌ গিয়া? ভেগে অমনি গেলেই হোল? তোকেই আজ আমি পুলিশের সঙ্গে চালান ক'রে দেবো। টাঙ্গির মত একজোড়া গোঁফ দেখেই আমি ভুলে যাবো ভেবেছিস? বল্ শীগ্‌গির, কে খুললে!

আমি!—আমি খুলেছি, আমি খুলে দিয়েছি। বলতে বলতে ঠিক এই সময়ে বিমলাকে সঙ্গে নিয়ে এসে পড়লেন প্রতাপ রায়। দারোগা-পুলিশের ভীড় দেখে বিমলা আর সেখানে না দাঁড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

অশ্বিনী জিজ্ঞেস করলো, তুমি কেন দরজা খুললে, বাবা ?

প্রতাপ রায় বল্‌লেন, খুলে ফেলেছি তার আর কী হবে ?

অশ্বিনী নরম হ'য়ে বললে, খুলে ফেলেছ, বেশ ক'রেছ, কিন্তু বিজয়কে যেতে দিলে কেন ?

ছেলের কাছে কোন কাজের জন্য জবাবদিহি করবেন বুড়ো হ'লেও এতখানি নিস্তেজ প্রতাপ রায় হন নি। ঘাড় সোজা করে তিনি বললেন, তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিয়ে পারবো না অশ্বিনী, আমি তোমার বাবা।

তারপর দারোগার দিকে ফিরে যথারীতি সৌজন্য দেখিয়ে তিনি বল্‌লেন, কেন মিছে আর দাঁড়িয়ে রয়েছেন আপনারা, থানায় ফিরে যান। আপনাদের মিছামিছি কষ্ট দেওয়া হোলো।

শুকুলকে ডেকে গাড়ীতে ক'রে দারোগা-পুলিশ সবাইকে থানায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলেন প্রতাপ রায়। পুলিশের লোকজন চ'লে যাবার পর তিনি অশ্বিনীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, নাও এবার কী বলছো বলো।

অশ্বিনীর সমস্ত মত্‌লব মাটি হ'য়ে গিয়েছিল। নিতান্ত নিরুৎসাহ দেখিয়ে সে বললে, ধ্যেৎ, দারোগাকে বিদেয় করে, দিয়ে—এখন কী বলছো বল ! বিজয় কী করেছে জানো ?

—জানি।

—সেই জন্যেই ভেবেছিলাম দারোগাকে দিয়ে—দিই ওকে একটুখানি ভয় খাইয়ে। নইলে ও যেরকম হ'য়ে উঠছে—

—কী হ'য়ে উঠছে ?—জিজ্ঞেস করলেন প্রতাপ রায়।

হাতমুখ নেড়ে অশ্বিনী বললে, 'পপুলার'—'পপুলার'। গাঁয়ের সবাই ওকে ভালবাসে।

এর ভেতরে অশ্বিনীর আপত্তির কী থাকতে পারে ভেবে পাচ্ছিলেন না প্রতাপ রায়। তিনি ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে চললেন।

অশ্বিনীও তাঁর পেছন পেছন বলতে বলতে চললো' হতভাগা, একেবারে হতচ্ছাড়ার একশেষ। গাঁয়ের লোকের চিকিচ্ছে করে, একটি পয়সা নেয় না।

—প্রতাপ রায় বললেন, ভালোই তো!

—ভালো? অশ্বিনী অবাক হ'য়ে গেল বাবার বিবেচনা দেখে। সমস্ত ব্যাপারটা বাবাকে তলিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলো সে: একে তো সেই কেলোটা দিয়েছে ওর সব্বনাশ ক'রে, তার ওপর নিজের তেমন রোজগার নেই, ভাগ্যিস্ সংসারে তিনজন লোক, তাই বুঝতে পারছে না, নইলে ও যতো গরীব হবে ততই ও পেছনে লাগবে আমাদের। তারপর একবার যদি সেই লাল ঝাণ্ডার দলে গিয়ে মেশে, তখন দেখবে শ্রমিকসঙ্ঘ, হেনো তেনো সাত-সতেরো ক'রে একেবারে বিদিকিচ্ছি কাণ্ড ক'রে বসবে।

নিশ্চিন্ত মনে নিজের আরামকেদারায় ব'সে প্রতাপ রায় বললেন, না-না ওসব কিছু ও করবে না।

—করছে, আবার বলে করবে না!—বাবার কথায় চুপ ক'রে না থাকতে পেরে অশ্বিনী জবাব দেয়।

প্রতাপ রায় বলেন, আচ্ছা আচ্ছা সে ব্যবস্থা আমি করেছি। বিমলার সঙ্গে আমি ওর বিয়ে দেবো।

—আমার মেয়ে বিমলার সঙ্গে? বিয়ে? অসম্ভব কথাটা বিশ্বাসই করতে পারে না অশ্বিনী।

বড়ো রায় পরিষ্কার ক'রে বলেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার মেয়ের সঙ্গে বিজয়ের বিয়ে।

—তাই কখনও হ'তে পারে?

—কেন পারে না?

—তুমি কি পাগল হ'য়েছ?

—পাগল এখনো হইনি বলেই বলছি।

মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে অশ্বিনী বলে'—না না এ অসম্ভব। আমার মেয়ের বিয়ে আমি ওরকম ক'রে দেবো না।

রাগ দেখিয়ে চলে যাচ্ছিল অশ্বিনী, প্রতাপ রায় ডাকলেন, অশ্বিনী! অশ্বিনীকে ফিরতে হোল : কী?

—আমার কথা শোন্।

—না, শুনবো না।—বেপরোয়া হ'য়ে জবাব দেয় অশ্বিনী।

প্রতাপ রায় বলেন, আমি এখনো বেঁচে আছি, অশ্বিনী। প্রতাপ রায় এখনো মরেনি।

—তা জানি।—অশ্বিনীও সমানে সমানে জবাব দেয়।

কাঁপতে কাঁপতে প্রতাপ রায় বলেন, এই সব বিষয়-সম্পত্তি, বাড়ীঘর টাকাকড়ি—যতদিন বেঁচে আছি—সব আমার। মরবার আগে আমি উড়িয়ে পুড়িয়ে নষ্ট ক'রে ছতিচ্ছন্ন ক'রে দিয়ে যাব।

ভয় দেখান তিনি অশ্বিনীকে, তোমাকে আমি পথের ভিকিরী ক'রে দিয়ে যাব যদি তুমি আমার কথা না শোনো।

অশ্বিনী কিন্তু কোন কিছুতেই টলে না। নিজের গোঁ সে আঁকড়ে ধরে থাকে : তুমি যা খুশী তাই করতে পারো, এ বিয়ে আমি কিছুতেই দেবো না।

প্রতাপ রায়ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, বিয়ে তিনি দেবেনই। তিনি বলেন, তুমি না দাও, আমি বিয়ে দেবো।

অশ্বিনী বলে, কন্যা তো সম্প্রদান করতে হবে আমাকেই!

প্রতাপ রায় বলেন, না তাও দরকার হবে না, আমি—আমি নিজেই কন্যা সম্প্রদান করবো।

প্রতাপ রায়ের যেই কথা, সেই কাজ। অশ্বিনীর কোন ওজর-আপত্তি গ্রাহ্য না ক'রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিজয়ের সঙ্গে বিমলার

বিয়ের আয়োজন করে ফেললেন তিনি। কন্যা সম্প্রদান করতেও এসে বসলেন তিনি নিজেই।

অশ্বিনী আর কতক্ষণ মুখ গোম্‌ড়া ক'রে থাকবে। হাজার হোক নিজের মেয়ের বিয়ে। তাছাড়া নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটির কথা বাইরের পাঁচজনের কাছে জানাজানি হ'য়ে যাবে এটাও ভালো দেখায় না। শেষ পর্য্যন্ত গরদের চাদর গায়ে জড়াতে জড়াতে ভীড় ঠেলে বিবাহ-মণ্ডপে এসে হাজির হোল সে। বাবাকে বললে, যাও, ওঠো তুমি। আমি এসেছি।

বাপ থাকতে দাছু এসে সম্প্রদান করছেন দেখে সবাই মনে একটু খুঁত-খুঁতি ছিল। এখন অশ্বিনী এসে বসায় খুশী হ'য়ে উঠলো সবাই। পুরোহিত আনন্দ প্রকাশ ক'রে বললে, হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেই ভালো। বাপে-ছেলেতে মনোমালিন্য—বিশেষতঃ এই আনন্দের দিনে—

পুরোহিতের বাচালতা ভালো লাগে না অশ্বিনীর। একে তো তার রাগ তখনো পড়ে নি, তার ওপর আবার যোগ হ'য়েছে পরাজয়ের লজ্জা। পুরোহিতকে ধমক দিয়ে সে বললে, থাক্ থাক্, খুব হ'য়েছে। তুমি তোমার নিজের কাজ কর। মন্ত্র বলো তাড়াতাড়ি।

এক ধমকেই আক্কেল হ'য়ে গেল পুরোহিতের। সে আর কোন দিকে না তাকিয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গর্‌গর্‌ ক'রে মন্ত্র পড়াতে লেগে গেল!

বিয়ের পরদিন বর-ক'নেকে সঙ্গে নিয়ে প্রতাপ রায় নিজেই এসে উপস্থিত হ'লেন চৌধুরী-বাড়ীতে! মহামায়াকে ডেকে বললেন, কই গো মা—এই নাও তোমার ছেলে নাও, তোমার বৌ নাও। আমি আমার কথা রেখেছি।

আনন্দে ছু'চোখ ফেটে জল এলো মহামায়ার। নিজের ছেলে আর ছেলে-বৌকে ছু'হাত বাড়িয়ে কোলের মধ্যে টেনে নিলেন। বিমলা

শাশুড়ীর পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছিল। মহামায়া বাধা দিয়ে বললেন, না মা, আমাকে প্রণাম করবার আগে এসো আমার সঙ্গে।

বিজয় আর বিমলার হাত ধরে তিনি তাদের ভেতরে নিয়ে চললেন। প্রতাপ রায় বুঝলেন, স্বামীর ঘরে দুজনকে নিয়ে চলেছেন মহামায়া। স্বর্গগত স্বামীর তৈলচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে সবার আগে এই নব-দম্পতির জন্যে আশীর্বাদ ভিক্ষে করতে চান তিনি।

আত্মপ্রসাদে ভ'রে উঠলো প্রতাপ রায়ের মন। এতদিনে দুই পরিবারের ভেতর যে একটা পবিত্র যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হোল—সেই আনন্দে তাঁর মুখচোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। চৌধুরীর নায়েব বনমালী ধীরে ধীরে তাঁর কাছে এসে বললে, আপনি আজ যা করলেন, কত্তারও ঠিক এই ইচ্ছেই ছিল।

প্রতাপ রায় সেকথা জানতেন। ভবানী চৌধুরী বেঁচে থাকতে এমন মিলনটা দেখে যেতে পারলেন না সেজন্যে তাঁর মনেও বড়ো আফশোষ হচ্ছিল। আবেগভরা কণ্ঠে ধীরে তিনি বললেন, মৃত্যুর পরে মানুষের কিছুই তো জানি না বনমালী, যদি কিছু অস্তিত্ব থাকে তো তাঁর আত্মা শান্তি পাবে।

বিয়ের পরের দিনগুলো খুব আনন্দেই কাটবে ব'লে আশা করেছিল বিমলা। ছেলেবেলার খেলার সাথী এলো জীবন-সাথী হ'য়ে। শ্বশুর-বাড়ীটিও বেশ নিরিবিলি, আত্মীয়-স্বজন চাকর-বাকরের ভীড় নেই, শুধু শ্বাশুড়ী আর স্বামী। নতুন-বউ এখানে গলা ছেড়ে গাইলেও পাড়ার লোক নিন্দে করতে আসবে না। তাই ব'লে যে শ্বশুর-বাড়ীতে এসে বেহায়া-পনা করতে নেই তাও বিমলা ভালো করেই জানে। তবু মনের খুসী সে কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিল না। বারান্দার এককোণে একটা নিরালা জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনমনে একটা আনন্দের গান গাইছিল সে। কখন যে বিজয় পা টিপে টিপে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে

গান শুনছিল তা সে টেরও পায় নি। গানের শেষে হঠাৎ বিজয়কে দেখে ভারী লজ্জা লাগলো তার। ফিক ক'রে হেসে ঘোমটা টেনে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সে।

বিজয় বললে, মনে আছে বিমলা, ছেলেবেলায় একদিন আমার একটা ময়না পাখী উড়িয়ে দিয়েছিলে তুমি! সে-পাখী যে আর কোনদিন ফিরে পাব আশাও ছিল না। আজ দেখছি সেই পাখীটাই গান গাইতে গাইতে আমার কাছে এসে নিজে থেকেই ধরা দিল।

পাখী-হারানোর কথা বিমলার বেশ ভালো ক'রেই মনে ছিল। সেদিন যার কাছে পাখী দাও পাখী দাও ব'লে আব্দার করতে একটুও লজ্জা করে নি, আজ কেন জানি না চোখ তুলে তার দিকে তাকাতেই পারছিল না বিমলা।

বিজয় জিজ্ঞেস করলো, ভালো লাগছে তোমার এখানে এসে?

বিমলা জবাব দেয় না তবু। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকে চুপটী ক'রে।

—চুপ ক'রে রইলে যে? দু'হাত দিয়ে বিমলার মুখখানা নিজের দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বিজয় বলে, বলো কেমন লাগছে!

বিমলা তখনও মাথা হেঁট ক'রে রইলো দেখে একটু অভিমান দেখালো বিজয়ঃ বল্‌বে না? বেশ, চল্‌লুম আমি তাহ'লে।

বিজয় চ'লে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি তার হাতখানা চেপে ধরলো বিমলা। বিজয় বললে, বা-রে! যেতেও দেবে না, কথাও বলবে না, বেশ মজা তো! বল—তুমি এ-বিয়েতে খুশী হ'য়েছ কিনা!

মুখ খুলতেই হোল বিমলাকে। হাসতে হাসতে সে বললে, হ'য়েছি, হ'য়েছি, হ'য়েছি। হোলো তো!

ঠিক এমনি সময়েই বাড়ীর ভেতর থেকে মহামায়া ডাকলেন, বৌমা!

ডাক শুনেই বিমলা আর এক সেকেণ্ডও সেখানে দাঁড়ালো না। মা ডাকছেন, আমি যাই—ব'লেই তাড়াতাড়ি ছুটলো শ্বাশুড়ীর কাছে।

বিজয় বললে, কথাটা শুনেই ফিরে এসো। আমি এইখানেই অপেক্ষা করছি।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বিমলা চ'লে গেল। বিজয় একা একা পায়চারি করতে লাগলো সেখানে।

রান্নাঘরে ব'সে লুচি বেল্‌ছিলেন মহামায়া। বিমলা আস্‌তেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, রাত্তিরে তুমি কী খাও বৌমা? ভাত, লুচি, রুটী না পরোটা?

বিমলা বললে, আপনারা যা খাবেন আমিও তাই খাবো।

—তা নাহয় খেলে, কিন্তু একটা অভ্যেস তো আছে! বড়লোকের মেয়ে—

—বড়লোকের মেয়ে ব'লে ঘরা'না অভ্যেস আমার কিছু নেই। সত্যি বল্‌ছি মা, আমি যা পাই তাই খাই। বলতে বলতে শ্বাশুড়ীর পাশে ব'সে বিমলা বললে, আপনি উঠুন মা, আমি লুচি বেলবো।

মহামায়া তো অবাক: ওমা সেকি কথা! বিয়ের ক'নে, আজই তোমার হাতে কাজ তুলে দেবো?

—তা হোক, আমি বেল্‌বো। ছোট মেয়েটীর মতো আব্দার করে বিমলা।

মহামায়া বলেন, তোমাদের বাড়ীতে বামুন, চাকর-ঝি—কত লোক। এসব কি তোমার অভ্যেস আছে?

বিমলাও আড়াআড়ি ক'রে বলে, আচ্ছা দেখুন আমি পারি কি-না।

ব'লেই সে বেলুন-চাকী টেনে নিয়ে লুচি বেলতে সুরু করে। বৌমার এই ছেলেমানুষি ভারী মিষ্টি লাগে মহামায়ার। শুধু একটা জিনিস তাঁর পছন্দ হয় না। একদিনেই এত আপনা-আপনি ভাব দেখিয়ে মুখে 'আপনি' বলে কথা বলাটা কেমন যেন বেসুরো লাগে তাঁর কানে। তিনি বলেন, আমাকে আপনি-আপনি বলছো কেন বৌমা?

—কী ব'লবো ? জিজ্ঞেস করে।

মহামায়া বলেন, আমার নিজের মেয়ে থাকলে কী বলতো ? 'তুমি বলবে।

বিমলা ঘাড় নেড়ে বলে, আচ্ছা, তাই বলবো এবার থেকে।

তাড়াতাড়ি একখানা লুচি বেলে সে মহামায়াকে দেখায়ঃ এই দেখুন —না-না, ছাখো তো মা, হ'য়েছে ?

—ওমা, এযে বেশ হ'য়েছে। খুশী হ'য়েই বলেন মহামায়া।—আমি যাই ঘি-টা নিয়ে আসি।

বিমলা বাধা দিয়ে বলে, না, আমি তোমাকে কিছু করতে দেবো না মা। তুমি বল কোথায় ঘি আছে, আমি আনবো।

এমন ক'রে যে কেউ কোনদিন মহামায়ার কাছে থেকে কাড়াকাড়ি ক'রে সমস্ত সংসারের কাজের ভার নিজের হাতে তুলে নেবে আর তার বদলে মহামায়ার প্রাণ ভ'রে এত সুখ, এত শান্তি এনে দেবে তা' তিনি কখনো কল্পনাও করতে পারেন নি। নিজের মনেই তিনি তাই আক্ষেপ করতে লাগলেন, আজ আমার এত সুখ, এত শান্তি—সবই হোলো, উনি শুধু দেখে যেতে পারলেন না।

তারপর বিমলাকে তিনি বুঝিয়ে বললেন, আজ আমি তোমার হাতের কাছে সব এনে দিচ্ছি, কাল থেকে তুমি নিজেই সব কোরো।

মহামায়া গেলেন ঘি আনতে। বিমলাও শ্বাশুড়ীর কথামতো আবার তার নিজের জায়গায় ফিরে এসে লুচি বেলতে বসলো।

বিমলার জন্যে অপেক্ষা ক'রে ক'রে বিজয় ওদিকে অস্থির হ'য়ে উঠেছে। এখানে একবার দাঁড়াচ্ছে, ওখানে একবার দাঁড়াচ্ছে, বারে বারে ভেতরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। কিন্তু বিমলার আর আসবার নামই নেই। বিমলা কী করছে দেখবার জন্যে শেষ পর্য্যন্ত বিজয় পা টিপে গিয়ে হাজির হোল রান্নাঘরের পেছনে। রান্নাঘরের জানলা বন্ধ করা ছিল

ভেতর দিক থেকে। শুধু শার্সির একখানা কাঁচ বরাত গুণে ভাঙা ছিল। তারই ফাঁক দিয়ে বিজয় দেখলো, পেছন ফিরে ব'সে ব'সে বিমলা লুচি বেলছে একমনে—ঘরে আর কেউ নেই।

ঠক্ ক'রে জানলায় একটা শব্দ করলো বিজয়। আওয়াজ শুনে বিমলাও চট্ ক'রে একবার দেখেই লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিল। বিমলার দৃষ্টি-আকর্ষণ করবার জন্যে হাতছানি, চোখ-ইশারা, মুখভঙ্গী কিছু করতেই আর বিজয় বাকী রাখলো না। বিমলা তবু মুখও তোলে না—কথাও বলে না। মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে হাসতে সে শুধু মাথা হেঁট ক'রে লুচি বেলতেই লাগলো। অধৈর্য্য হ'য়ে বিজয় শেষ পর্য্যন্ত গলা-খ্যাঁকারি দিলে কয়েকবার। বিমলাও তার হাতের বেলুনটা তুলে মার লাগাবার ভঙ্গী ক'রে বোঝালো, আর বেশি বাড়াবাড়ি করলে বিপদ হবে বিজয়ের।

দেখতে দেখতে মহামায়া এসে পড়লেন ঘিয়ের টিন হাতে ক'রে। বিজয় তো সঙ্গে সঙ্গেই দে-ছুট।

ঘিয়ের টিন নামিয়ে দিয়ে মহামায়া বললেন, এই নাও বৌমা, সাবধানে কাজ কোরো। বিয়ের ক'নে, দেখো যেন হাত-পা পুড়িয়ে ব'সো না।

কিন্তু বিয়ের ক'নে হ'লে হবে কী? বিমলা কোন কাজই করতে আর বাকী রাখলো না। কুট্‌নো কোটা, বাটনা বাঁটা সব সেরে নিজেই গেল দুহাতে দুটো বড়ো বড়ো বালতি নিয়ে জল তুলে আনতে।

জল নিয়ে ফিরতে দেখে মহামায়া বললেন, একী করছো বৌমা? লোকে দেখলে বলবে কী? আমাকে দোষ দেবে যে!

জল টানতে টানতে হাঁপিয়ে পড়েছিল বিমলা। একটা বালতি সিঁড়িতে নামিয়ে রেখে এসে হাসতে লাগলো খিল্‌খিল ক'রে।

হাসি দেখে মহামায়া বললেন, আবার হাসছে ত্যাখো! দাও, আমাকে একটা বালতি দাও।

বিমলা বললে, না-না মা, তোমার দুটী পায়ে পড়ি—আমিই নিয়ে

যাব। ভালো ক'রে কোমরে আঁচলটা জড়িয়ে বালতি নিয়ে হাসতে হাসতে বিমলা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

বৌ-য়ের পাগলামি দেখে মহামায়া রাগ করবেন, না হাসবেন ভেবে পেলেন না। তিনি শুধু মুখ টিপে বললেন, দাঁড়াও না, আমি বিজয়কে সব বলে দিচ্ছি গিয়ে।

বিজয়কে আর কিছু ব'লে দিতে হোলো না। এমনিতেই সে বউয়ের সঙ্গে খুনসুটি করতে ওস্তাদ। রাত্রিবেলা মা-র ঘরে ঢুকে সে দেখলো, মা শুয়ে আছেন বিছানায় আর তার পায়ের কাছে ব'সে পা টিপে দিচ্ছে বিমলা।

টিটকিরী দিয়ে ব'লে উঠলো বিজয়, বা-বা! এই তো চাই। রায়েদের বাড়ীর মেয়ে চৌধুরীদের বাড়ীতে এসে ঝি-এর কাজ করছে, পা টিপছে।

বিমলাও রাগের ভাণ দেখিয়ে বললো, যাও, আমার যা খুশী তাই কোরবো। তোমার কী?

মহামায়া ভাবলেন, মুখে ঠাট্টা করলেও নতুন-বৌ শাশুড়ীর পা টিপে দেবে এটা হয়তো মনে মনে বিজয়ের ঠিক পছন্দ হ'চ্ছে না। নিজের দিকটা বাঁচিয়ে তিনি তাই বললেন, ও কিছুতেই শুনবে না। যতো বারণ করছি, ও তত বেশি বেশি করছে। আমাকে জোর ক'রে শুইয়ে—ওই স্থাখনা—পা টিপতে বসলো।

বিজয় নালিশ জানালো, অথচ আমি একটা কাজ করতে বলি, কিছুতেই শুনবে না।

—হুঁ, শুনবে! ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে বিমলা।

মহামায়া হেসে বললেন, না বাবা, মিছে কথা বলিস্ নি। ও খুব লক্ষ্মী মেয়ে।

বিমলাকে আর পায় কে? শাশুড়ী নিজেই যখন তার পক্ষে তখন

বিজয়ের নিন্দায় তার কী-ই বা আসে যায়? হাবভাবে বিজয়কে সে বুঝিয়ে দিল: কেমন শুনলে তো—আমার সম্বন্ধে কত ভালো ধারণা আছে মা-র!

মহামায়া বিজয়কে বললেন, আমি শুধু ভাবছি কাল ওকে নিতে আসবে, বৌমা চ'লে গেলে আমি থাকবো কেমন ক'রে?

বিমলাকে ছেড়ে থাকা বিজয়ের পক্ষেও কম ভাবনার কথা নয়। তবু মনের ভাবটা গোপন করার জন্যে সে হেসে উঠলো হো-হো ক'রে: ওরে বাবা, য্যাদ্দিন ছিলে কেমন ক'রে? তেমনি ক'রে থাকবে।

বিজয় মুখে উপহাস করলেও, তার চোখের ভাষাটা ছিল অন্যরকম। সেটা একা বিমলাই বুঝতে পারলে। বিজয় চ'লে যাওয়ার পর শ্বাশুড়ীর হাত ধ'রে বিমলা তাই বললে, না মা! এত শীগ্‌গির আমি কিছুতেই যাবো না। কাল পালকি এলে তুমি ফিরিয়ে দিও।

মেয়ের শ্বশুরবাড়ী থেকে সত্যি-সত্যিই পালকি ফিরে এসেছে শুনে অশ্বিনী রায় তো একেবারে ক্ষেপে আগুন। আমার পালকি ফিরিয়ে দেবে? পালকি ফিরিয়ে দেওয়া আমি বে'র করছি।

চৌধুরীদের আস্পর্দ্ধার কথাটা সে বাবাকে জানাতে এলো তাড়াতাড়ি: বিমলার বিয়ে তো দিলে খুব আনন্দ ক'রে, কী ক'রেছে জানো?

—কী ক'রেছে? জিজ্ঞেস করলেন প্রতাপ রায়।

—পালকি ফিরিয়ে দিয়েছে। মেয়ে পাঠায় নি।

এতে তেমন দোষের কিছু দেখতে পেলেন না প্রতাপ রায়। বললেন, বেশ তো, মেয়ে যতো শ্বশুর-বাড়ীতে থাকে ততই ভালো।

—তাই ব'লে ওই বাড়ীতে? কথাটা ভাবতেও অশ্বিনীর গা রী-রী করতে লাগলো: একটা চাকর নেই, ঝি নেই, রাঁধুনী নেই, রায়েদের বাড়ীর মেয়ে চৌধুরীদের বাড়ী গিয়ে দাসী বাঁদির মতো খেটে খেটে ম'রবে,

দু'বেলা পেট ভ'রে খেতে পর্য্যন্ত পাবে না, আর আমি তাই চুপ ক'রে দেখবো?

—তা' কী করবে তুমি? জিজ্ঞেস করেন প্রতাপ রায়।

অশ্বিনী তাল ঠুকে বলে, ক'রব মানে? করেছি। সেই পালকি আমি আবার পাঠিয়ে দিয়েছি—বিজয়ের মাকে আচ্ছা ক'রে চিঠি লিখে দিয়েছি ওই সঙ্গে। আসুক একবার, তারপর দেখাচ্ছি মজা।

—কী মজা দেখাবে?

—মেয়েকে আর কখ্‌খনো ও-মুখো হ'তে দেবো না। কিছুতেই পাঠাব না।

প্রতাপ রায় যুক্তি দেখান, ছেলে আবার বিয়ে করবে তা'হলে।

—বিয়ে ক'রবে? এ-গাঁয়ের বাস তুলে দেবো না?

এমন সময়ে অশ্বিনীর ছেলে কমল এসে খবর দিল, দিদিকে নিয়ে এলাম। বিজয়দাও এলো সেই সঙ্গে।

বিমলার সঙ্গে সঙ্গে বিজয়কেও আসতে হ'য়েছে দেখে মনে মনে খুবই গর্ব্ববোধ করতে লাগলো অশ্বিনী। বাবাকে ডেকে বললে, ওই শোনো। আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হ'য়েছে, ও তো ধন্য হ'য়ে গেছে। বিয়ে ওর দিত কে নইলে?

হঠাৎ খেয়াল হোল তার যে কমলের সামনে এসব কথা বলা তার উচিত হ'চ্ছে না। কমলকে সে তাই ভাগিয়ে দিয়ে বললে, আমার বাড়ীতে যদি থাকতে চায় তো ঘর-জামাই হ'য়ে থাক না ও; কে বারণ করছে?

প্রতাপ রায় বললেন, মা-র ওই একটিমাত্র ছেলে, ছেলে-বৌ নিয়ে ঘর করবে না সে? থাকতে দেবে কেন এখানে!

অশ্বিনী বললে, বেশ তো, আমার মেয়েকে নিয়ে ঘর করতে চায়, অবস্থা ভালো করুক, রোজগার করুক, আর নইলে বলুক আমাকে, ওর

মামা সেই কেলেটাকে ধ'রে এনে আচ্ছা ক'রে ঠেঙ্গিয়ে আদায় ক'রে দিচ্ছি —ওর যা কিছু নিয়েছে সব।

প্রতাপ রায় দেখলেন, এতক্ষণে একটা সত্যিকারের কাজের কথা বেরিয়েছে অশ্বিনীর মুখ থেকে। তিনি আরেকটু উস্কে দিলেন অশ্বিনীকে, বলতে হবে! তোমার জামাই-এর সম্পত্তি উদ্ধার করবে তা'ও তোমার হাতে-পায়ে ধ'রে বলতে হবে?

অশ্বিনী বুঝলো, এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ মত আছে বাবার। হুঁ ব'লে সে তক্ষুণি সব ব্যবস্থা করবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো।

প্রতাপ রায় জিজ্ঞেস করলেন, কী হোল, চললে কোথায়?

অশ্বিনী বললে, দারোয়ান পাঠাচ্ছি, কেলোকে ধ'রে আনুক, তারপর আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের হাড়িকাঠে পুরে ওকে বলিদান ক'রে দিই।

অশ্বিনী চ'লে গেল। ছেলের চরমপন্থী পরিকল্পনা দেখে প্রতাপ রায় একটু হাসলেন মনে মনে।

চাপরাশী দিয়ে কালুকে বাড়ী থেকে আনিয়ে বিজয়ের শ্বশুর খুব মারধোর করছে শুনে ভয়ানক ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন মহামায়া। একটা খোঁজখবর করবার জন্যে বিজয়কে বলতে এলেন তাড়াতাড়ি। বিজয় তো প্রথমটা বিশ্বাসই করতে চায় না যে তার কালুমামাকে পাচুণ্ডি থেকে আনিয়ে মারধোর করতে পারে কেউ। সে বললে, ধ্যেৎ, তাই কখনও পারে? কে বললে? কোথায় শুনলে তুমি?

মহামায়ার সব কিছু গোলমাল লাগছিল দুশ্চিন্তায়। তিনি একটু ভেবে নিয়ে বললেন, ওই যে রে নাপিতের ছেলেটা—কি নাম ছাই —প্রভাকর। প্রভাকর ব'লে গেল, কালু নাকি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তোকে খবর দিতে বলেছে।

প্রভাকর যখন ব'লে গেছে, তখন কথাটা একেবারে মিথ্যে হয়তো না-ও হতে পারে। ভাবনায় পড়লো বিজয়: তাহ'লে তো দেখতে হয় একবার।

মহামায়া তাগিদ দিলেন, হ্যাঁ বাবা, যা একবার দেখে আয়।

সার্টের ওপর কোটটা চাপাতে চাপাতে বিজয় বললে, কিছু বিশ্বাস নেই মা, আমার শ্বশুরটি করতে পারে না এরকম কাজ পৃথিবীতে কিছু আছে ব'লে তো আমার মনে হয় না।

বিজয় তাড়াতাড়ি তার শ্বশুর-বাড়ীর দিকে চললো। বিজয়ের দিকে চেয়ে আপন মনেই বললেন মহামায়া, বিয়েটা এখানে দেওয়াই বোধহয় আমার ভুল হোলো।

কালুর হাতে মোচড় দিয়ে টানতে টানতে অশ্বিনী তাকে নিয়ে এলো তাদের চণ্ডীমণ্ডপে। কালুর গায়ে গলাবন্ধ কোট, গালে-মাথায় কম্ফার্টার জড়ানো। প্রাণপণে চীৎকার লাগিয়েছে সে।

অশ্বিনী ধমক দেয়, অত চেঁচাচ্ছো কেন?

কাঁদো কাঁদো স্বরে কালু বলে, চেঁচাবো না? একে আক্কেল দাঁত উঠেছে তার যন্ত্রণায় মরছি, তার ওপর জ্বরে কোঁ-কোঁ করছি তিন দিন ধরে। এখন আবার তোমার মোচড়ের ঠেলায় হাতখানা ভেঙে গেল যে!

অশ্বিনী বলে, যাক না। মাথাটাও তো যাবে। হাড়িকাঠ দেখছো? সামনেই দেখা যাচ্ছিল একটা রাক্ষুসে হাড়িকাঠ। কালু বললে, হুঁ।

—ওইখানে তোমার মাথাটা গলিয়ে দিয়ে বলিদান করবো। ভয়ে ভয়ে একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসলে কালু।

অশ্বিনী জিজ্ঞেস করলো, বিশ্বাস হ'চ্ছে না? শুকুল! শুকুল!

—জি! ব'লে সেলাম দিয়ে শুকুল এসে দাঁড়ালো।

অশ্বিনী হুকুম দিল, পাঁঠা কাটবার খাঁড়াটা নিয়ে এসো।

শুকুল খাঁড়া আনতে গেল। অশ্বিনী কালুকে বললে, বিজয়ের টাকাকড়ি, বিষয়-সম্পত্তি যা-কিছু তুমি নিয়েছ সব ফেরৎ দিতে হবে।

ভিজে-বেড়ালটির মতো কালু বললে, কিছুই তো আমি নিই নি।

—না, কিছুই তুমি নাও নি! পাঁচুণ্ডী, গড়বেতা, চণ্ডীপুর আর বিজয়নগর—এই চারটে বড় বড় জমিদারী মৌজো ভবানী চৌধুরীর ছিল কি-না?

—হ্যাঁ, ছিল।

—সেগুলো তোমার স্ত্রীর নামে গেল কেমন ক'রে?

তাড়াতাড়ি জিব কেটে কালু বললে, আরে রাম বল। আমার স্ত্রীর নামে তো নয়। আমার এক ভায়রাভাই আমার শালীর নামে নিলেম খরিদ ক'রেছে। আমি তার কিছুই জানতাম না। পরে শুনেছি।

—হ্যাঁ, কিছুই জানতে না, পরে শুনেছো! আমার রাগ বাড়িয়ো না কালু, আমি তোমাকে আজ এখান থেকে জ্যান্ত ফিরে যেতে দেবো না। তাতে আমার যা-হয় হবে।

শুকুল এমন সময়ে খাঁড়া নিয়ে ফিরলো। কালুর হাত ধ'রে হিঁচড়ে টেনে অশ্বিনী বললে, এসো তুমি, ওই খাঁড়া এসে গেছে।

আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো কালু, উঃ, গেলাম, গেলাম।

অশ্বিনী বললে, কোন কথা শুনবো না। আমার গাড়ী আছে, গাড়ীতে চ'ড়ে আমার সঙ্গে তোমার বাড়ী যাবে, দলিল নেবে, বৌ হোক শালী হোক, যার নামে বেনামী খরিদ ক'রেছ তাকে নেবে, তারপর রেজেষ্ট্রী আপিসে গিয়ে আমার মেয়ের নামে সব লিখে দেবে। রাজি?

চিঁ-চিঁ ক'রতে ক'রতে কালু বলে, কী যে বলছো বেয়াই, আমি নিই নি—

—এখনও বলছো নিই নি?

—হ্যাঁ, এখনো বলছি, সত্যি আমি নিই নি।

অশ্বিনী বললে শুকুল, দাও তো খাঁড়াটা। মুণ্ডু আর কাটবো না, ধরো ওর হাতখানা হাড়িকাঠের ওপর চেপে, আঙুলগুলো কেটে উড়িয়ে দি। সহজে ও দেবে না বুঝতে পারছি।

শুকুল নিজেই খাঁড়াটা উঠিয়ে বললে, আপ জোর্‌সে প্যাকড়্ লি জিয়ে, হাম কাট দেতা।

অশ্বিনী বললে, সেই ভালো, তুমিই কোপ্ লাগাও।

কালুর হাতটা জোর ক'রে হাড়িকাঠের ওপর চেপে ধরলো অশ্বিনী। কালু দেখলো, সর্ব্বনাশ! খোট্টাই বুদ্ধি! আর এক সেকেণ্ড দেরী হ'লেই হয়তো ঝপ্ করে কোপ্ বসিয়ে দেবে। তাড়াতাড়ি প্রাণের দায়ে সে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, দেবো-দেবো, চল-চল আমার সঙ্গে চল্।

শুকুলকে খাঁড়া নামাতে ব'লে অশ্বিনী কালুকে বল্‌লে, চল শীগ্‌গির তাহ'লে।

কালুকে নিয়ে অশ্বিনী এগুতে যাবে, ঠিক এমন সময়ে মামা-মামা ব'লে ডাকতে ডাকতে বিজয় এসে উঠলো চণ্ডীমণ্ডপে। শুকুলের হাঁতে খাঁড়া, আর মামার জড়োসড়ো অবস্থা দেখে সে অশ্বিনীকে জিজ্ঞেস করলো, এ কী করছেন?

অশ্বিনী জবাব দিল, তোমার মামাকে কাটবো ভেবেছিলাম। নেহাৎ তোমার সব-কিছু ফিরিয়ে দিতে রাজী হোল তাই, নইলে আজ আমি ওকে—

বিজয়কে দেখে এতক্ষণ ধড়ে প্রাণ এলো কালুর। সে বিজয়কে বললে, ঢাখো বাবাজি, ঢাখো, তোমার শ্বশুরের কাজ ঢাখো। আমি কি নিয়েছি যে ফিরিয়ে দেবো? বলছি আমার এক শালীর নামে—

অশ্বিনী ধমক দিল, চুপ্। বিজয়কে দেখে আবার সুর পালটাচ্ছ! এসো তবে এদিকে। খাঁড়াটা আনো শুকুল!

হাড়িকাঠের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে কালুকে ধ'রে আবার টানা-হেঁচড়া সুরু করলো অশ্বিনী। কালু চেঁচাতে লাগ্‌লো বিজয়-বিজয় ব'লে।

বিজয় অশ্বিনীকে বললে, আঃ, ছাড়ুন, ছাড়ুন। কী ক'রছেন এসব?

নিজেই সে জোর ক'রে অশ্বিনীর হাত থেকে ছাড়িয়ে দিলে কালুকে। যেই ছাড়া পাওয়া, কালুও অমনি ছুটে পালাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো

ছিটকে। কাঁচা-কোঁচা খুলে গেল তার। সেই অবস্থাতেই দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল সে।

কালুকে বিজয় ছাড়িয়ে দিলে দেখে অশ্বিনী জিজ্ঞেস করলো, ওকে ছেড়ে দিলে যে বড়ো? বিষয়-সম্পত্তি তুমি চাও না? ও কিন্তু দিতে রাজী হ'য়েছিল।

বিজয় হেসে বললে, আপনার চেয়ে ওকে আমি বেশী চিনি। শেষ পর্য্যন্ত দিত'না।

—ওর বাপ দিত। ম'রে যাবার ভয়ে দিত।

বিজয় নিজের মনে কী ভেবে বললে, না দিয়েছে ভালই হ'য়েছে। ভগবান আমাকে রক্ষা করেছেন।

—তার মানে? অশ্বিনী জিজ্ঞেস করলো।

বিজয় ম্লান হেসে বললে, মানে খুব সোজা। জমিদারী আমার ধাতে সইবে না।

অশ্বিনী ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, জমিদারীর দোষটা কী আমাকে বলতে পারো?

পাল্টা প্রশ্ন করলো বিজয়, বিদেশী গভর্ণমেণ্টের কী দোষ আপনি বলতে পারেন, যা' থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সারা ভারতবর্ষ ছট্‌ফট্ করছে? বিদেশী গভর্ণমেণ্টও যা, আপনার ওই জমিদারীও তাই। একই যন্ত্রের বড়ো চাকা আর ছোট চাকা।

অশ্বিনী বললে, তোমাদের ও-সব হেঁয়ালী বুঝবার মতো বিদ্যে-বুদ্ধি আমার নেই। আসল কথা তুমি তাহ'লে বলতে চাও—টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে সুখে তুমি থাকতে চাও না।

—আমার যা আছে তাই নিয়ে আমি খুব সুখে আছি। নিশ্চিন্তভাবে উত্তর দিল বিজয়।

বিদ্রূপ ক'রে উঠলো অশ্বিনী: তোমার আছে কী যে সুখে থাকবে!

একটু ভেবে নিয়ে একটা নতুন প্রস্তাব করলো সে বিজয়ের কাছে: আমার কলিয়ারীতে চাকরি করবে?

বিজয় মাথা নেড়ে বললে, আজ্ঞে না। এখনও সেরকম দুরবস্থা আমার হয় নি।

—তাহ'লে আমার বাড়ীতেই থাকো তুমি।

—ঘর-জামাই হ'য়ে?

—হ্যাঁ, দোষ কি?

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বিজয় ব'ললে, আপনি তো আমাকে চেনেন, কেন এসব কথা বলছেন বলুন তো?

অশ্বিনী কিছু জবাব দেবার আগে বিজয়ই একটু থেমে আবার ব'ললে, আমি বুঝতে পেরেছি। রায়েদের মেয়ে চৌধুরীদের বাড়ীতে যাবে—আপনার দম্ভে কোথায় যেন আঘাত লাগছে!

অশ্বিনী বললে, হ্যাঁ ঠিক তাই। তোমার অবস্থার উন্নতি যতদিন না করতে পারো আমার মেয়ে ততদিন তোমাদের বাড়ীতে যাবে না।

—আপনার মেয়ে আপনি না পাঠাতে পারেন, কিন্তু আমার স্ত্রী আমি জোর ক'রে নিয়ে যাব।

—জোর ক'রে?

—হ্যাঁ।

—আমার বাড়ী থেকে?

—হ্যাঁ।

অশ্বিনী হেসে বললে, পারবে না।

বিজয় বললে, নিশ্চয়ই পারবো।

অশ্বিনী জিজ্ঞেস করলো, যদি না পারো?

—আমিও আর আপনার বাড়ী আস্‌বো না। জিদের বশে হঠাৎ প্রতিজ্ঞা ক'রে বসলো বিজয়।

বাড়ী ফিরবার মুখে বিজয় তার শালা কমলের হাত দিয়ে একটুকরো চিঠি পাঠালো বিমলার কাছে। বিমলা তখন মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে শাড়ী পছন্দ করছিল। কমল এসে লুকিয়ে জামাইবাবুর চিঠিটা দিদিকে দিতে যাবে, এমন সময়ে মা দেখে ফেললো। কাগজের টুকরোটা কেড়ে নিয়ে মা পড়ে দেখলো তাতে লেখা আছে—

বিমলা, চট্ ক'রে একবার এসো।

বিজয়।

সলজ্জ ভাবে একটু হেসে চিঠিটা মা বিমলার হাতে দিল। কমলকে বললে, তা এর জন্যে এত লুকোচুরি কিসের?

জামাই মেয়ে একটু নিরিবিলিতে কথা বলতে চায় দেখে কমলকে মা সরিয়ে নিয়ে গেল সেখান থেকে।

বিমলা চিঠিটা পড়লো। চিঠির ওপর থেকে চোখ তুলে দেখে জানলার সোজাসুজি দূরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিজয় তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ঘরে কেউ নেই, তা সত্ত্বেও বিজয় ঘরে আসছে না দেখে বিমলা নিজেই শেষপর্য্যন্ত এগিয়ে গেল বিজয়ের কাছে।

বিজয়ের সামনে এসে বিমলা বললে, এ আবার কি ঢং! চিঠি দিয়ে এইখানে দাঁড়িয়ে,—মা চিঠিখানা দেখে ফেললে যে!

বিজয় বললে, দেখুক গে!

—হ্যাঁ, দেখুক গে! লজ্জার ভাব দেখিয়ে বিমলা বললে, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এসো ঘরে এসো।

—না ঘরে যাবনা। তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারো?

বিমলা জিজ্ঞেস করলো, কোথায়?

বিজয় বললে, যেখানে আমি বলবো।

বিমলা মাথা নেড়ে সায় দিল, হুঁ, খুব পারি।

বিজয় বিমলার হাত ধ'রে বললে, এসো তাহ'লে আমার সঙ্গে।

'চল' ব'লে বিমলাও বিজয়ের দৌড় কত দেখবার জন্যে এগিয়ে চললো। খানিকদূর গিয়ে দেখে বিজয় সত্যিসত্যিই তাকে টানতে টানতে বাড়ীর বাইরে নিয়ে চলেছে। বিমলা তাড়াতাড়ি থামালো বিজয়কে : একি ? সত্যি চললে ?

বিজয় বললে—হ্যাঁ।

বিমলা জিজ্ঞেস করলো, এক্ষুণি ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। দ্বিগুণ জোরের সঙ্গেই বললে বিজয়।

বিমলা অবাক হ'য়ে গেল। একটু কিন্তু ক'রে সে বললে, ছাখো তো। আমি মনে করলাম তুমি হাসি-রহস্য করছো।

বিমলা যে শেষ পর্য্যন্ত এই ধরণেরই কোন ছুতো করবে তা বিজয় আগেই আন্দাজ ক'রেছিল। বিরক্ত হ'য়ে সে বললে, তাহ'লে তুমি যেতে পারো না বল।

বিমলা তবু সাহস দেখায় : কেন পারবো না ?

বিজয় বলে, যাচ্ছনা, আবার বলে কেন পারবো না!

বিমলা বলে, মা-কে একবার ব'লে আসি। খুঁজে মরবে যে!

বিজয় বাধা দেয় : না, কাউকে বলতে পাবে না।

চোখ ঘুরিয়ে বিমলা বলে, বাবা বকবে না বুঝি ?

বিজয় হাত ছেড়ে দেয় বিমলার : তাহ'লে তোমার যাওয়া হোল না। আমি চললুম। কোনদিন আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

বিমলাকে ফেলে বিজয় চ'লে যাচ্ছিল। বিমলা আবার ফেরালো তাকে : ওগো, শোনো! শোনো!

—কী শুনবো ? পিছু ফিরে দাঁড়ালো বিজয়।

বিমলা জিজ্ঞেস করলো, আমার ওপর রাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছ ?

—না, আমি কারও ওপর রাগ করি না। মনের ভাব মনেই চেপে রাখলো বিজয়।

বিমলা আবার প্রশ্ন করলো, তবে যে আর আসবে না বলছো?

গম্ভীর হ'য়ে বিজয় বললে, হ্যাঁ, আমি আর আসতে পারবো না।

বিমলাকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়েই বিজয় চলে গেল। বিমলা পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িলে রইল চুপটী ক'রে। তারমনে হ'তে লাগলো যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে তার মাথায়। হাসি-ঠাট্টার ভেতরে হঠাৎ কেন যে এমন বিপর্য্যয় ঘটে গেল—কেন যে রাগ ক'রে চলে গেল বিজয়, ভেবে ভেরে সে তার কিছুই কূলকিনারা পেল না।

বিমলাকে একলাটি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মা এসে জিজ্ঞেস করলো, কীরে, বিজয় কি চলে গেল নাকি?

মা-য়ের কথা শুনে চমক ভাঙলো বিমলার। 'হুঁ' বলে মাথা নীচু ক'রে ঘরে ফিরে গেল সে।

মা বুঝে উঠতে পারলো না বিজয়ের এমন হঠাৎ এসে হঠাৎ চলে যাওয়ার কারণ কী। জামাই থাকবে ভেবে তার জন্যে খাবার তৈরী করতে ব'লে এসেছিল সে। দোতলা থেকেই রাঁধুনীকে ডেকে সে তাই বারণ করে দিল, থাক, আর খাবার ক'রতে হবে না পদ্মর মা। জামাই এসেছিল, বিমলা বলছে, চলে গেল।

কথাটা শুনতে পেয়েই বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে থ'মকে দাঁড়াল অশ্বিনী।

—বিজয় এসেছিল?

বিমলার মা বললে, হ্যাঁ, এইমাত্র দেখ্‌লাম—এলো আর চ'লে গেল।

—তোমার মেয়ে কোথায়? জিজ্ঞেস করলো অশ্বিনী।

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বিমলার মা, ওই তো, ওই ঘরে।

বিমলা বিজয়ের সঙ্গে যায়নি দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো অশ্বিনী। —বা বা, এই নইলে আমার মেয়ে! বিজয় বলে—ওকে সে জোর ক'রে নিয়ে যাবে। আমার বাড়ী থেকে আমার মেয়েকে জোর করে নিয়ে যাবে! —শোনো কথা!

হো-হো ক'রে হাসিতে একেবারে ফেটে পড়লো অশ্বিনী। বিজয়ের উঁচু মাথা নীচু হ'য়েছে জানতে পেরে হাসি আর তার থামতেই চায় না।

পাশের ঘরে মনের দুঃখে খাটের একটা কোণ ধ'রে বসেছিল বিমলা। বাবার হাসি যেন তীরের মতো এসে বিঁধতে লাগলো তার কানে। স্বামীর অবহেলা, বাবার বিদ্রূপ সে আর সহ্য করতে পারলো না। অপমানে দুঃখে ডুক্‌রে ডুকরে কেঁদে উঠলো সে।

রায়েদের বাড়ী থেকে ফিরে এসেই বিজয় মা'র কাছে সব কথা জানালো। বললে, তোমার বউ যদি এ-বাড়ী না আসে তুমি কি করতে চাও বল। ছেলের কথা শুনে আশ্চর্য্য হ'য়ে যান মহামায়া : ওকি কথা রে? বৌ কেন আসবে না! বিজয় বলে, আমি বলছি আসবে না, আসতে পারবে না, ওর বাবা ওকে পাঠাবে না। কথাটা বিশ্বাস হয় না মহামায়ার।—না পাঠাবে না! তোর যেমন কথা! বাপ হ'য়ে মেয়ের সর্ব্বনাশ করবে?

বিজয় বলে, হ্যাঁ করবে, ও এক অদ্ভুত ধরণের মানুষ।

মহামায়া বলেন, না না ও যেমনই হোক, তোর শাশুড়ী দেখবি কারও কথা শুনবে না, জোর ক'রে পাঠিয়ে দেবে।

বিজয় তবু মাথা নাড়ে : পারবে না—পারবে না। আমার শ্বশুরের ভয়ে সব থর্ থর্ ক'রে কাঁপে। ওর কথার ওপর কথা বলবার সাহস কা'রও নেই।

মহামায়া জিজ্ঞেস করলেন, আসল কথা, কী বললে তোর শ্বশুর বল্‌তো।

বিজয় বললে, কী আর বলবে? বল্‌লে, আমরা গরীব। রায়েদের বাড়ীর মেয়ে চৌধুরীদের বাড়ীতে এসে দাসীবাঁদীর কাজ করতে পারবে না।

ঘরের কাজকর্ম্ম করা নিয়ে কথা উঠেছে শুনে মনে আঘাত পেলেন মহামায়া। বললেন, কে বলছে কাজ করতে! এত ক'রে তখন বারণ করলাম—বৌমা কাজ কোরো না—কোরোনা—কিন্তু শুন্‌লে কা'রও কথা!

বিজয় দেখলো মা সমস্ত ব্যাপারটাকে নিজের অপরাধ ব'লে ভুল করেছেন। সে মা-কে বোঝালো, না মা না, ও-সব কথা আমার শ্বশুর জানে না। এখানে বিয়ে দেবার ইচ্ছেই ওর ছিল না, হয়ে যখন গেল, কী আর করবে, এখন আবোল তাবোল বকছে। বলছে, আমার মেয়ে যাবে না, তুমি আমার বাড়ীতে ঘর-জামাই থাকো।

অশ্বিনী এমন উদ্ভট প্রস্তাব ক'রেছে শুনে ব্যঙ্গ না ক'রে পারেন না মহামায়া : ওমা আমার কে রে! আমার একটি মাত্র ছেলে ঘর জামাই থাকতে যাবে কী দুঃখে। আমি ছেলে-বৌ নিয়ে ঘর ক'রবো না?

চিন্তিতভাবে বিজয় বলে, সে সাধ তোমার এ বৌ নিয়ে মিটবে ব'লে তো মনে হয় না।

বিজয় মুস্‌ড়ে পড়েছে দেখে মহামায়া ভরসা দেন তাকে : তুই তো আমার মেয়ে নোস্‌ বিজয়, আমার ভয় কিসের? দরকার হয়, আমি আবার তোর বিয়ে দেবো।

কালু-মামা এতক্ষণ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সব কথা কাণ পেতে শুনছিল। বিয়ের কথা শুনেই সে এগিয়ে এলো ঘরের ভেতর। বললে, বল না দিদি, কালই বিজয়ের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি!

কালুকে দেখে মহামায়া অবাক হ'য়ে বললেন, ওমা, তুই বাড়ী যাবি বললি, যাস্‌ নি এখনও?

কালু বললে, না গেলুম আর কই, সব শুনলুম যে!

মহামায়া ভাইয়ের কাছে পরামর্শ চাইলেন, ছাখ দেখি কাণ্ড, এখন আমি করি কি?

কালু বললে, বিয়ে দাও।

মহামায়া বললেন, কিন্তু আমার বৌ-টি যে বড় ভালো। ঝপ্‌ ক'রে বিয়ে না দিয়ে আমি বলি কী, বিজয় কিছুদিন চুপ ক'রে থাকুক দেখি। জামাই যদি শ্বশুরবাড়ীতে না যায়, মেয়ে নিয়ে কতদিন আর থাকতে

পারবে ও? এ-বুদ্ধিটা বেশ ভালোই লাগলো কালু-মামার। সে-ও বার বার ভাগ্নেকে সাবধান ক'রে দিল: সেই ভালো ভাগ্নে, ওদিক দিয়ে আর তুই হাঁটবি না, ও-রাস্তা আর তুই মাড়াবি না।

বিজয় হাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না। চুপচাপ শুধু মা-আর মামার হুকুমটা শুনে যায়।

দু'চার দিন বিমলার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না হওয়াতেই কিন্তু বিজয়ের মন হাঁপিয়ে উঠলো একেবারে। নিজের প্রতিজ্ঞা, মা ও মামার হুকুম কিছুই সে আর রাখতে পারলো না। লুকিয়ে লুকিয়ে একদিন সে গিয়ে হাজির হোল রায়েদের খিড়কীর রাস্তায়। দূর থেকে বিজয়কে আসতে দেখেই কমল ছুটে এসে তার দিদিকে খবর দিল: দিদি দিদি, তুমি ব'লেছিলে জামাইবাবু আর এ-রাস্তা মাড়াবে না, ওই দ্যাখো কে আসছে!

বিমলা দেখে সত্যিই বিজয় এসে উপস্থিত। দিদি ভগ্নীপতির আলাপ-আলোচনায় থাকতে নেই বুঝে কমল আগে থেকেই স'রে পড়েছিল।

বিজয় বিমলার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, কী করবে ঠিক করলে, বিমলা?

বিমলা বললে, এখানে এমন ক'রে দাঁড়িয়ে কথা বলে না। ভেতরে এসো।

বিজয় বাড়ীতে ঢুকতে চায় না: তোমার বাবা যখন তোমাকে আমাদের বাড়ী পাঠাবে না, তখন আমিই বা তোমাদের বাড়ী ঢুকবো কেন?

সেইখানেই একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বিজয় বসলো। বিমলা জিজ্ঞেস করলো, কে বললে বাবা আমাকে পাঠাবে না?

—তবে আর সেদিন শুনলে কী? আমরা গরীব, আমাদের বাড়ীতে মেয়ে পাঠালে তোমার বাবার মান যাবে।

—তাহ'লে আমিও যাব না, তুমিও আস্‌বে না? ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করলো বিমলা।

দৃঢ় কণ্ঠে বিজয় বললে, না।

নিরুপায় বিমলা, মেয়েদের শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলো সে: আমাকে তা'হলে আর দেখতে পাবে না।

—কী ক'রবে? জিজ্ঞেস করলো বিজয়।

বিমলা বললে, ম'রে যাব—যেমন ক'রে পারি। তুমি দেখো, আমি কিছুতেই আর বেঁচে থাকবো না।

বিজয় বললে, ছি ছি, ও আবার কী কথা? মরণের কথা কি মুখে আনে?

—তাহ'লে আমি কি করবো বলো।

—বলবে তোমার বাবাকে।

বাবার নাম শুনেই ভয় পেয়ে যায় বিমলা: ওরে বাবা, সে আমি পারবো না। বাবাকে ভীষণ ভয় করে আমার।

—মা-কে তো বলতে পারবে?—দাদুকে?

—কী বলবো?

—বলবে, তুমি যাবে আমাদের বাড়ী।

এমন কথা মা কিম্বা দাদুকে ব'লতে হবে ভাবতেই লজ্জা করে বিমলার। সে বলে, ধ্যেৎ, লজ্জা করবে যে!

হাল ছেড়ে দিয়ে বিজয় বলে, বেশ, থাকো তাহ'লে যেমন আছো।

—তুমি আস্‌বে না আর? ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে বিমলা।

মুখ ফিরিয়ে বিজয় বলে, না, আমার কাজ আছে, আমি আর আসতে পারবো না।

বিজয় চ'লে গেল।

পরদিন বিকেলে ঠিক তেমনি সময়ে খিড়কীর দরজা খুলে বিমলা দেখতে এলো বিজয় আর আসে কি না। এদিক ওদিক তাকিয়ে একটু এগিয়ে আসতেই দেখে, বিজয় কাল যেখানে বসেছিল ঠিক সেইখানেই বসে আছে চুপটী ক'রে।

মুচকি হেসে বিমলা বললে, আসবে না বললে, আবার এলে যে! বিজয়ও হাসি চেপে বললে, তুমিও মরবো বললে, কই ম'রলে না তো?

বিমলা বললে, দেখো মরি কিনা!

বিজয় বললে, পরে দেখবো। যতক্ষণ বেঁচে আছো—এসো, ব'সো এইখানে। আঁতকে উঠে পিছু স'রে গেল বিমলা: ওরে বাবা, না, এখানে বসবো না। সাপ আছে।

—কাল তো ব'সেছিলে। সাপের কথা তো বল নি।

হাসতে হাসতে বিমলা বললে, কাল মরতে চেয়েছিলাম যে!

—আর আজ? জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো বিজয়।

আব্দারের ভঙ্গীতে বিমলা বললে আজ ম'রতে ইচ্ছে ক'রছে না। চল ঘরে চল।

—ঘরে?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু—

—না, কোনো কিন্তু-টিন্তু শুনবো না, তুমি এসো। বিজয়ের হাত ধ'রে টানতে লাগলো বিমলা।

বিজয় বললে, কেউ যদি দেখে ফেলে!

বিমলা বললে, ওরে বাবা, কী পাপই না করছো! কেউ দেখলে একেবারে ফাঁসি হবে যেন!

যেতে যেতে হঠাৎ কী ভেবে বিজয় বললে, না থাক। যাব না।

বিজয়কে আর বেশী টানাটানি করতে সাহস হোল না বিমলার।

চারিদিক চেয়ে একটা বেশ নির্জ্জন গাছতলা খুঁজে বে'র করলো। আঙুল দেখিয়ে বললে সে, ঘরে যদি না যাবে তো—ঐখানে চলো।

চারিদিকে গাছপালা আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানে একটা খড়ের গাদা। নিরিবিলিতে কেউ যেন গদী পেতে বিছানা ক'রে রেখেছে দু'জনের জন্যে। সেই খড়ের গাদার ওপর গিয়ে গা এলিয়ে দিলে বিজয়; আর বিজয়ের কাঁধে মাথা রেখে বিমলা বসলো তার পাশে।

বিজয় বলতে লাগলো, ছাখো বিমলা, এখন মনে হ'চ্ছে, বিয়েটা যেন আমাদের না হ'লেই ভালো হোত।

বিমলা জিজ্ঞেস করলো, কেন?

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বিজয় বললে, তুমিও সুখী হ'তে পারলে না, আমিও সুখী হ'তে পারলাম না।

বিমলা বিজয়ের দিকে চোখ তুলে বললে, আমি কিন্তু তোমাকে পেয়ে সুখী হ'য়েছি।

—আমাকে আর পাচ্ছ কোথায়? ম্লান হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলো বিজয়।

দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধ'রে বিমলা বললে, এই তো পেয়েছি।

বিজয় বললে, এমন লুকিয়ে লুকিয়ে চোরের মতো?

বিমলা চুপ ক'রে রইলো। বিজয় বলতে লাগলো, আমি কিন্তু এ-লুকোচুরি পছন্দ করি না। অন্তরের সত্যকে গোপন ক'রে লাভ নেই। পাপ যেখানে, অপরাধ যেখানে, সেইখানেই তো ভয়।

এসব নীতিকথা শুনতে ভালো লাগছিল না বিমলার। সে ব'ললে, তোমার ওসব কথা আমি বুঝতে পারি না।

বিজয় বললে, কোনদিনই পারবে না বুঝতে।

দুষ্টুমির হাসি হেসে বিমলা বললে, বুঝতে আমি চাইও না। তুমি এমনি ক'রে আমার কাছে থাকো, আমি হাসতে হাসতে সব দুঃখু সহ্য ক'রবো।

বললে, কাল আর আসবে না বলে চলে গেলে যে বড়ো! আমাকে এরকম ক'রে কষ্ট দিতে ভারী ভাল লাগে, না? কাল রাত্তিরে ভাল ক'রে ঘুমোতেই পারি নি।

বিজয় বললে, আচ্ছা, আজ ব'লে গেলাম, কাল থেকে আর কক্ষণো আসবো না। ভালো ক'রে ঘুমিয়ো!

বিমলা বুঝলো, বিজয় তাকে রাগাবার জন্যেই আসবো না ব'লে ভয় দেখায়। যাঃ-ও! ব'লে সে বিজয়কে হাত ধ'রে খাটের ওপর নিয়ে বসালো। তারপর তার মনের কথাটা পাড়লো বিজয়ের কাছে : দ্যাখো, কাল একটা কথা ভাবছিলাম, শোনো।

বিজয় বললে, বলো।

—বাবা তোমাকে রোজগার করতে বলেছে, বড়লোক হ'তে বলেছে, এই তো!

—হ্যাঁ।

—তা অন্যায়টা কী বলেছে? অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করে বিমলা। —রোজগার তুমি করবে না?

বিজয় জবাব দেয়, করি তো!

বিমলা বিদ্রূপ ক'রে বলে, কী করো তা আমি জানি মশাই জানি। ডাক্তারী করো, গরীবদের কাছে পয়সা নাও না। তা এ-গাঁয়ে বড়লোক ক'জন আছে, সবাই তো গরীব।

বিজয় বলে, চ'লে তো যাচ্ছে।

বিমলা বলে, চ'লে তো সবারই যায়। আমাদের বাড়ীর চাকর-দারোয়ানদেরও চ'লে যায়।

বিমলার মা এমন সময়ে ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। জামাই-মেয়ের কথা শুনে জানালার খড়খড়ি তুলে উঁকি মেরে দেখলো সে। তারপর মুচকি হেসে খানিক দূরে গিয়ে বারান্দার রেলিং ধ'রে সে দাঁড়িয়ে রইলো,

যাতে চট্ ক'রে এদিকপানে কেউ না এসে পড়ে তাই দেখবার জন্যে। বিজয় বা বিমলা কেউই তা জানতে পারলো না। আগের মতই গল্প করতে লাগলো তারা।

বিজয় বললে, ও তুমিও তাহ'লে চাও আমি অনেক টাকা রোজগার করি—খুব বড়লোক হই!

বিমলা বললে, কোন্ মেয়ে চায় না! সব মেয়েই চায় তার স্বামী খুব রোজগার করুক।

বিজয় বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু রোজগার করবো বললেই তো আর—ব'লতে ব'লতে থেমে গেল সে। হঠাৎ বাইরে কী যেন সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি জানালার কাছে গিয়ে খড়খড়িটা একটু ফাঁক ক'রে দেখতে লাগলো। বিমলাও তার কাঁধে হাত দিয়ে মুখের পাশে মুখ দিয়ে উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগলো।

বাইরে তখন বিমলার মা'র সামনে দাঁড়িয়ে হাত-মুখ নেড়ে অশ্বিনী বলছে, বিজয়! বিজয়! তোমার জামাই।

বিমলার মা চাপা গলায় বলে, না না, আসে নি। কী সব কথা বলেছ শুনছি, মেয়ে পাঠাবে না নাকি, আসবে কেন?

অশ্বিনী তবু জোর দিয়ে বলে, না না তুমি জানো না, আসে। রোজ আসে লুকিয়ে লুকিয়ে, আবার লুকিয়ে লুকিয়ে চ'লে যায়।

ঘরের ভেতর থেকে এ-কথা শুনে বিজয় আর বিমলা মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে হাসে।

বিমলার মা বলে, আসে তো আসুক না, ভালই তো। মেয়ের বিয়ে দিয়েছ, আসবে না?

অশ্বিনী বলে, আসতে তো বারণ করছি না। কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে কেন আসবে? সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে আসুক, সবাই জানুক যে চৌধুরীদের বাড়ীতে মেয়ের বিয়ে আমি দিয়েছি, কিন্তু মাথা হেঁট ক'রে

নয়। মেয়ে যায় না, ছেলেই থাকে আমার বাড়ীতে—ঘর-জামাই হ'য়ে—অন্নদাস হ'য়ে।

অশ্বিনীর শেষ কথাগুলো যেন চাবুকের মত বিজয়ের গায়ে লাগে। বিমলাকে সে টানতে টানতে সরিয়ে আনে জানালার পাশ থেকে। দুঃখে-অপমানে কাঁপতে কাঁপতে সে বিমলাকে বলে, এখনও তুমি বলছো বিমলা, এমনি লুকিয়ে লুকিয়ে আমি তোমাদের বাড়ী আসবো, আর তুমি যাবে না?

বিজয়ের মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে বিমলার গলা শুকিয়ে যায়। সে যে কী বলবে তা ভেবে পায় না। থর্ থর্ ক'রে তার ঠোঁট দুটো শুধু কাঁপতে থাকে আর দুচোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে টপ্ টপ্ ক'রে।

বাইরে তখনো অশ্বিনী শাসিয়ে চলেছে: আমার মেয়ের ভালোমন্দ আমি জানি। আমার কথার ওপর কেউ কথা বলবে না ব'লে দিচ্ছি।

এমন সময়ে হঠাৎ কমলকে আসতে দেখে সে বললে, কমল, তুই চট্ ক'রে যা দেখি একবার বিজয়দের বাড়ী! দেখে আয়—বিজয় বাড়ীতে আছে কিনা। থাকে যদি, আমার নাম ক'রে ডেকে আন্। যা, চট্ ক'রে, যাবি আর আসবি।

হুকুমটা করেই অশ্বিনী চ'লে গেল গট্‌মট্ ক'রে।

বাবা চলে গেছে দেখে কমল জুতো পরতে পরতে হাত-ইসারায় মাকে ডাকলো। মা কাছে আসতেই কমল বললে, বিজয়দা' তো দিদির ঘরেই আছে মা, আমি দেখেছি।

মা চাপা গলায় বললে, আঃ, তোর অতসব কথায় দরকার কী? তোর বাবা যা ব'ললে তাই কর। তুই যা না যেখানে যাচ্ছিস্।

কমল বুঝলো না তাকে এমন মিছিমিছি হয়রাণ করার মানে কী? তবু কথাটী না বলে সে তাড়াতাড়ি বিজয়দের বাড়ীর দিকে চললো।

বিজয়দের বাড়ী এসেই ডাকাডাকি করতে লাগল কমল : বিজয়দা! বিজয়দা!

ডাকাডাকি শুনে বেরিয়ে এলেন মহামায়া : কে রে, কমল! বিজয় তো বাড়ীতে নেই। অনেকক্ষণ বেরিয়েছে বাড়ী থেকে।

কমল বললে,, থাকবে না আমি জানি। ও ঠিক আমাদের বাড়ীতেই আছে।

মহামায়া মাথা নেড়ে বললেন, না, তোমাদের বাড়ী তো সে যাবে না।

কমল বললে, যাবে না! তাহ'লে তুমি সব জানো! আমি নিজে দেখ্‌লুম দিদির ঘরে ঢুকলো চুপি চুপি। রোজ যায়।

মহামায়া তো অবাক : রোজ যায়? তুমি দেখেছ?

কমল আরো জোর দিয়ে বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ রোজ যায়।

সব কথা ভালো ক'রে জানবার জন্যে মহামায়া কমলকে বললেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবা? বোসো।

কমল বললে, না বসবো না। বাবা ব'কবে।

কমলের কথায় আঘাত পেলেন মহামায়া: আমাদের বাড়ীতে বসলেও তোমার বাবা ব'কবে?

কমল চালাক ছেলে। কথাটা তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে নিল সে : না-না, বাবাকে চট্ ক'রে গিয়ে ব'লতে হবে কিনা বিজয়দা এখনও বাড়ী ফেরে নি, তাই। আমি চললুম।

যাবার মুখে আর একবার সে নিজের মনে মনেই বলে গেল, বিজয়দা ঠিক দিদির ঘরে খিল বন্ধ ক'রে ব'সে আছে।

কমল চ'লে যাওয়ার পরেও কিছুক্ষণ সেখানে থ'মকে দাঁড়িয়ে রইলেন মহামায়া। তারপর চেঁচিয়ে ডাকলেন, নায়েব মশাই! নায়েব মশাই!

বনমালী এলো।—মা! কিছু বলছো?

মহামায়া বললেন, বড় রায়ের সঙ্গে চুপি চুপি একবার দেখা করতে বলেছিলাম, গিয়েছিলে ?

বনমালী বললে, হ্যাঁ মা গিয়েছিলাম।

তারপর একটু থেমে মাথা চুলকে সে বললে, বিজয়ের বিয়ে আবার দিতেই হবে মা।

অভিমানে ভেঙে পড়লেন মাহামায়াঃ কিন্তু কার বিয়ে দেবে বাবা? ছেলে যে আমার এরই মধ্যে পর হ'য়ে গেছে। লুকিয়ে লুকিয়ে রোজ সেখানে যাওয়া-আসা করছে।

কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না বনমালী।—না, না, আপনি ভুল শুনেছেন মা। বিজয় আমাদের—

বনমালীর কথা শেষ হবার আগেই বিজয়ের ডাক শোনা যায়ঃ মা! মহামায়া বনমালীকে বলেন, ওই আসছে। ওকেই জিজ্ঞাসা কর।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বিজয় বলে, কী জিজ্ঞাসা করবে, মা? খুব ক্ষিদে পেয়েছে, আগে কিছু ক্ষেতে দাও দেখি।

মহামায়া খোঁচা দিয়ে বলেন, যেখান থেকে এলে, সেখানে বুঝি খেতেও দেয় না?

বিজয় হঠাৎ হকচকিয়ে যায়।—বুঝতে পারলাম না কী বলছ।

মহামায়া বলেন, বুঝতে তো পারবিনে বিজয়। মা কি আর তোর সে মা আছে ?

মায়ের কথাগুলো যেন কেমন বাঁকা বাঁকা মনে হয় বিজয়ের। অনুযোগের কারণ কী ভেবে না পেয়ে সে বলে, ওকি কথা বলছ মা?

মহামায়া গম্ভীর হ'য়ে বলেন, ঠিক কথাই বলছি বাবা। মা-যে তোর এত ক'রে বললে রায়েদের দোর মাড়াস্ নি, ওদিক দিয়ে যাস্‌নি, কিছুদিন চুপ ক'রে থাক, দেখি কেমন ক'রে মেয়ে না পাঠায়, তা কি মা'র কথা তুই শুনলি ?

বিজয় কী বলবে? অশ্বিনীর অপমান তখনো সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি। তার মনে হয় সমস্ত ব্যাপারটা মা-র কাছে খুলে বলাই উচিত। একটু থেমে সে বলে, আচ্ছা মা, শোন তাহ'লে বলি—

বিজয়ের কোন কৈফিয়ৎ শুনবার আর উৎসাহ ছিল না মহামায়ার। তিনি বাধা দিয়ে বললেন, থাক আর বলতে হবে না বাবা, সব শুনেছি। রোজই তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে সেখানে যাও, আজও তুমি সেইখান থেকেই আসছো। অন্যায় কিছু করনি, তবু মা হয়ে আমি কেন যে বাদ সাধছি তা যদি তুমি বুঝতে বিজয়, তাহ'লে কখনো এ-কাজ করতে না।

বলতে বলতে মহামায়ার দু'চোখ জলে ভ'রে এলো। বিজয় এতক্ষণ মাথা হেঁট ক'রে মায়ের তিরস্কার শুনছিল। মুখ তুলে সে বললে, মা তুমি আমার কথা শুনবে?

বিজয়ের ওপর অভিমানে অস্থির হ'য়ে পড়েছিলেন মহামায়া। বিজয়ের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন তিনি: না না, তোমার কোন কথা আমি শুনবো না।

বিজয়কে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়েই তাড়াতাড়ি তিনি চ'লে গেলেন সেখান থেকে।

একে শ্বশুরের অপমান তার ওপর মায়ের গঞ্জনা!—ঘৃণায়-লজ্জায় ধিক্কার লাগলো বিজয়ের মনে। মনে মনে সে সঙ্কল্প করলো মায়ের কথা না শুনে যে পাপ সে করেছে যেমন ক'রেই হোক তার প্রায়শ্চিত্ত সে করবেই।

সেদিনকার রাত্রিটা নানারকম দুর্ভাবনায় কাটলো বিজয়ের। ওদিকে বিমলাও কী-যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখলো শেষরাত্রিতে। ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো সে। বিছানায় ব'সেই ডাক দিল: কমল! কমল!

কমলও তখন সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে। দিদির ডাক শুনে সে এসে জিজ্ঞেস করলো, আমাকে ডাকছো?

বিমলা বললে, হ্যাঁ। লক্ষ্মী ভাইটি আমার, চট ক'রে একবার যাও তো তোমার জামাইবাবুর কাছে।

সাতসকালে জামাইবাবুর জন্যে দিদির এতখানি আদিখ্যেতা ভালো লাগে না কমলের। গররাজীর ভাব দেখিয়ে সে বলে এক্ষুনি যেতে হবে? আমি এখনও চা খাইনি যে!

বিমলা তার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর দেখায়: যাও লক্ষ্মীটি, এসে খাবে। আমি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখলাম—তোমার জামাইবাবু আমার সঙ্গে খুব খানিকটা ঝগড়া ক'রে চলে গেল, বললে—আর আমি তোমার মুখ দেখবো না।

এটা কিছু নতুন খবর নয় কমলের কাছে। সে জানে জামাইবাবু রোজই দিদির সঙ্গে ঝগড়া ক'রে চ'লে যায় আবার রোজই ফিরে আসে। এরকম সখের ঝগড়ার ভেতরে মাথা ঘামাবার কিছু দেখতে পাচ্ছিল না কমল। তবু দিদির ক্রমাগত তাগিদে অতিষ্ঠ হ'য়ে শেষ পর্য্যন্ত তাকে ছুটতে হোল বিজয়দের বাড়ীর দিকে।

বিজয়দের বাড়ীতে ততক্ষণে খোঁজাখুঁজি পড়ে গেছে বিজয়ের জন্যে। চায়ের পেয়েলা হাতে ক'রে বিজয়ের ঘরে গিয়ে মহামায়া দেখেন, বিজয় নেই। শোবার ঘরে নেই, বসার ঘরে নেই, এত সকালে উঠে কোথায় যে সে গেল ভেবে পান না মহামায়া। নায়েব-মশাইকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, নায়েব মশাই! নীচের ঘরে বিজয় র'য়েছে?

নীচের থেকে বনমালী সাড়া দিল, না মা, বিজয় তো এখানে নেই। এদিক সেদিক তন্ন তন্ন ক'রে দেখতে লাগলেন মহামায়া। টেবিলের ওপর চায়ের পেয়ালাটী রাখতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর চোখে পড়লো একটুকরো কাগজ। চিঠি লিখে রেখে গেছে বিজয়—

মা, আমি এ গ্রাম ছেড়ে কিছুদিনের জন্যে চ'লে যাচ্ছি।
কিছু মনে কোরো না।

—বিজয়।

আঘাতের পর আঘাত পেয়েছেন মহামায়া। তবু বিজয়ের মুখ চেয়ে সবি তিনি সহ্য করে এসেছেন এতকাল। শেষ পর্য্যন্ত সেই বিজয়-ই যে এমন ক'রে তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে এ তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। সংসারের অশান্তিতে যদিই বা দু-একটা শক্ত কথা তিনি ব'লে থাকেন। তাই ব'লে ছেলে হ'য়ে মা-কে এতবড়ো শাস্তি দেওয়া কি উচিত হোল বিজয়ের?

এতদিনের স্নেহ-মমতার বাঁধন একমুহূর্ত্তে ছিঁড়ে গেল দেখে সারা মন তাঁর অব্যক্ত ব্যথায় আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো: আমাকে ছেড়ে তুইও শেষে চ'লে গেলি বিজয়!

বাঁধ-ভাঙা চোখের জলে ঝাপ্‌সা হ'য়ে গেল তাঁর দৃষ্টিপথ।

নিতান্ত নিরুপায় হ'য়েই গ্রাম ছেড়ে চ'লে যেতে হোল বিজয়কে! তার পক্ষে শ্বশুরের খামখেয়াল বরদাস্ত করা যেমন অসম্ভব ছিল, মায়ের হুকুম মেনে চলাও তার চেয়ে কম অসাধ্য ছিল না। গ্রামে থাকতে নিজের স্ত্রী বিমলার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না ক'রে থাকবার চেষ্টা বার বার সে ক'রেছে, কিন্তু থাকতে পারে নি। পারে নি এইজন্যে যে বিমলার ওপর রাগ করবার কোন কারণ সে দেখতে পায় নি কখনো। দুই জমিদার-বংশের মজ্জায়-মজ্জায় পুরুষানুক্রমিক বিবাদ-বিসম্বাদের তুষানল জ্বলছে, আর তা'রি মাঝখানে মিলনের সেতু বাঁধতে এসে আহুতি হ'য়ে জ্ব'লে মরবে বিমলা, এতবড়ো বিজয়ের অবিচার বিজয়ের বিপ্লবী মন স্বীকার করতে পারছিল না কিছুতেই। গ্রামে থাকলে পাছে মায়ের বিরুদ্ধেই দাঁড়াতে হয় শেষ পর্য্যন্ত, তাই বিমলার ওপর তার দুর্ব্বলতাটাকে এড়াবার জন্যে সে এলো ক'লকাতায়।

ক'লকাতায় এসে কোন জানাশোনা লোকের বাড়ীতে উঠল না বিজয়। রাস্তার দু'দিকের সাইনবোর্ড দেখতে দেখতে সে ফুটপাত দিয়ে চললো যদি কাছাকাছি একটা হোটেল বা মেস-টেস্ কিছু পাওয়া যায়। হঠাৎ

তার নজরে পড়লো রাস্তার ও ফুটপাতে একই দরজার ওপর পাশাপাশি দুটো সাইনবোর্ড :

সুলভ বোর্ডিং	COMMERCIAL
খাইবার ও থাকিবার	COLLEGE
বন্দোবস্ত আছে।	Short hand-Typewriting

গাড়ী-ঘোড়া বাঁচিয়ে রাস্তা পার হ'য়ে বিছানা স্যুটকেশ হাতে বিজয় ভেতরে ঢুকে পড়লো সেই দরজা দিয়ে।

ভেতরে ঢুকে দেখে দূরে একজন লোক টাইপ করছে আর বিড়ি টানছে। তার পরণে ছেঁড়া পাত্‌লুন, গায়ে হাফসার্ট, কানে পোড়া সিগ্রেট।

দোরের কাছে হাতের স্যুটকেশটা ও বালিশ-বিছানা নামিয়ে রেখে বিজয় তার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, এখানে খাবর থাকবার জায়গাটা কোথায় বলতে পারেন ?

লোকটী সেকথা কানেই নিল না। নিজের মনে সে টাইপ করছে তো করছেই। হঠাৎ মুখের বিড়িটা নিবে যেতে তার নজর পড়লো বিজয়ের দিকে। বিজয় আবার বললে, আপনি কি সুলভ বোর্ডিং-এর মালিক ?

বিজয়ের কথার কোন জবাব না দিয়ে ভদ্রলোক ডাকাডাকি সুরু করলো : শতদল! শতদল!

ঘরের পেছনদিকে একটা পর্দ্দা টাঙানো ছিল। সেই পর্দ্দা সরিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো একটী মেয়ে। আটপৌড়ে শাড়ী-পরা গেরস্তঘরের মতো শ্রী তার। বয়েস হ'লেও মাথায় এখনো সিঁদুর পড়ে নি। টাইপ্‌-বাবুর কাছে এগিয়ে এসে বেশ একটু চেঁচিয়ে সে বললে, আমাকে ডাকছো কাকাবাবু ?

কাকাবাবুটি হাত ইসারা ক'রে বললে লিখে নে।

ব'লেই সে বিড়ি ধরাতে ধরাতে আবার আগের মতন টাইপে মন দিল।

সামনের টেবিলের ওপর থেকে মোটা একটা বাঁধানো খাতা দুহাতে ক'রে ব'য়ে নিয়ে শতদল বিজয়কে ডেকে আনলো ঘরের এককোণে। খাতা খুলে কলম হাতে ক'রে সে জিজ্ঞেস করলো, নাম?—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

বিজয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জবাব দিলে, তা হোক, আপনি লিখুন। বিজয় চৌধুরী।

নাম লেখা শেষ ক'রে শতদল জিজ্ঞেস করলো, ঠিকানা?

ঠিকানা বলতে একটু ইতস্ততঃ করছিল বিজয়। সে হাঁ করবার আগেই তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শতদল বলল, নতুন এসেছেন বুঝতে পেরেছি। দেশের ঠিকানা বলুন।

বিজয় বললে, পুরন্দরপুর। বর্দ্ধমান জেলা।

ঠিকানাটা টুকে নিয়ে শতদল হাত নেড়ে বললে, ছ'মাস, তিনমাস আর মান্থ্‌লি—তিনরকমের আছে। কোনটা আপনার পছন্দ?

বিজয় দেখলো ছ'মাস বা তিনমাস বড্ড দেরী হ'য়ে যায়। একটু ভেবে সে বললে, না আমি মাসে মাসেই দেবো।

খাতায় 'মান্থ্‌লি' লিখে শতদল আবার প্রশ্ন করলো, শর্টহ্যাণ্ড্‌-টাইপরাইটিং কম্‌বাইণ্ড্‌, না শুধু শর্টহ্যাণ্ড?

বিজয়ের ধরণা ছিল এতক্ষণ হোটেলের বোর্ডার হিসাবেই নাম লেখাচ্ছে সে। হঠাৎ শতদলের মুখে শর্টহ্যাণ্ড-টাইপ্‌রাইটিং-এর নাম শুনে সে যেন আকাশ থেকে পড়লো একেবারে।—মানে? আপনি কি ভাবলেন আমি শর্টহ্যাণ্ড্‌-টাইপ্‌রাইটিং শিখতে এসেছি?

ছোটমেয়ের মতো খুব জোরে ঘাড় নেড়ে শতদল বললে, হ্যাঁ, এখানে তো তাই-ই শেখানো হয়। ঐ তো আমার কাকা—প্রিন্‌সিপাল্‌। হক্‌চকিয়ে যায় বিজয়। আম্‌তা আম্‌তা ক'রে সে বলে, তাহ'লে ঐ যে বাইরে সাইন বোর্ড্‌ দেখে এলাম, সুলভ বোর্ডিং, সেটা কোথায়?

এতক্ষণে শতদল বুঝলো বিজয় পথ ভুল ক'রেছে। সুলভ-বোর্ডিং-এর খোঁজে সে কমার্শিয়াল কলেজের ঘরে ঢুকে পড়েছে। শতদল হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল, ঐ যে ঐদিকে সুলভ বোর্ডিং ও পাইস হোটেল।

বিজয় খুশী হ'য়ে সেদিকে তাকাতেই মুখভার হ'য়ে গেল শতদলের। কলমের ডগাটা দাঁতে চেপে সে বললে, কিন্তু কলেজের পাকা খাতায় আপনার নামটা লিখে ফেললুম, কাকা তো ব'কবে।

তারপর একটু ভেবে নিয়ে খুব উৎসাহ দেখিয়ে শতদল বললে, তা' শিখুন-ই না শর্টহ্যাণ্ড-টাইপরাইটিং—চাকরির ভারী সুবিধে হবে।

অচেনা মেয়েটির এই প্রগল্‌ভতা বড় মজার লাগছিল বিজয়ের কাছে। সে একটু বিস্মিতভাবে বললে, শর্টহ্যাণ্ড!

উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো শতদল : হ্যাঁ, ভাববার কিছু নেই। বেশী টাকা না থাকে, টাইপরাইটিং লিখে দিই। পাকাখাতায় নামটা লিখে ফেললুম, কাকা এখুনি জমার টাকাটা চেয়ে বসবে, না দিতে পারলেই ব'কবে।

একটা জিনিষ ভারী আশ্চর্য্য লাগে বিজয়ের! এদিকে বিজয়ের সঙ্গে শতদলের এত কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে, শতদলের কাকার কিন্তু সেদিকে হুঁস নেই। নিজের মনে সে খালি টাইপ ক'রেই চলেছে। বিজয় শতদলকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, আপনি এত জোরে জোরে কথা বলছেন, উনি শুনতে পা'চ্ছেন না।

খিলখিলিয়ে হেসে নীচুগলায় শতদল বললে, না। কালা—কানে কম শোনে।

এমন কাকার এমন হাসিখুসী ভাইঝিটাকে দেখে কেমন যেন মনে ধ'রে যায় বিজয়ের। সে জিজ্ঞেস করে শতদলকে, কত টাকা জমা দিতে হবে আমাকে?

বিজয় টাকা জমা দিতে রাজী হ'য়েছে দেখে শতদল যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে যায়। সে বলে, মাত্র দশটাকা।—লিখে নিই?

পকেট থেকে দশটাকার একখানা নোট বের ক'রে দিয়ে বিজয় ব'ললে লিখুন।

লিখতে লিখতে বিজয়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে শতদল ব'ললে, বাঁচালেন আমাকে। খুব বেঁচে গেছি।—

তারপর সেই মোটাখাতা আর দশটাকার নোটখানি হাতে ক'রে সে তার কাকার কাছে চললো।

বিজয় তাকে ডেকে বললে, কিন্তু আমার থাকবার-খাবার ব্যবস্থাটা?

—ঠিক আছে সেসব। পেছন ফিরে ইসারা ক'রে জানিয়ে দিল শতদল।

কাকার সাম্‌নে মোটা খাতাটা খুলে ধ'রে শতদল বললে, এই নাও টাকা। সই ক'রে দাও, নইলে ব'লবে টাকা পাইনি। ভুলে যাবে।

কাকা কি শুনলো, কী বুঝলো সে-ই জানে। লাফিয়ে উঠলো সে: ভুল? ভুল হবে আমার? জীবনে কোনদিন কোন ভুল হ'য়েছে আমার যে তুই বলছিস আজ আমার ভুল হবে! কই একটা ভুল বের কর্ দেখি, গুণে গুণে সাত হাত নাকখৎ দেবো।

আঙুল দিয়ে কাকা তার টাইপকরা কাগজটা দেখাতে লাগলো সগর্ব্বে।

বিজয় চেয়ে দেখলো তা'তে অসংখ্য বানান ভুল আর অজস্র কাটাকুটি! শতদল তবু কাকার মেজাজ ঠাণ্ডা করবার জন্যে বললে, না না, তোমার টাইপের ভুল বলি নি। এইখানে একটা সই ক'রে দাও।

কলমটা এগিয়ে দিতে কাকা বুঝলো যে সই করতে হবে। শতদল যে তার টাইপের ভুল ধরেনি তাই বুঝে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে সে সই ক'রে দিল খাতায়।

কাকার কানের কাছে মুখ নিয়ে শতদল বললে, এইখানে থাকবো বলছেন। থাকবার কথা শুনেই আবার খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলো কাকা: থাক্‌বো অম্‌নি বললেই হোলো! ব'লে দে, জায়গা নেই।

শতদল কী বল্‌তে হবে না হবে তা আগেই গুছিয়ে নিয়েছিল মনে

মনে। সে তাড়াতাড়ি মনে করিয়ে দিল কাকাকে: কেন, ঐ দু'নম্বর ঘরটা···

কাকা মাথা নেড়ে বললে, না-না, ওখানে আমি 'কেলাস্' করবো। তারপর বিজয়কে ডেকে সে বললে, বলি ওহে ছোক্‌রা, শোনো! এখানে থাকতে চাইছো কেন?

বিজয় বললে, আর কোথাও থাকবার জায়গা নেই ব'লে।

বিজয়ের গলার আওয়াজ কানে ঢুকলো না কাকার। শতদলের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, কী বলছে?

গলাটা আরো এক পর্দ্দা চড়িয়ে দিয়ে শতদল বললে, আর কোথাও থাকবার জায়গা নেই।

গুরুগম্ভীর মুরুব্বিয়ানার ঢঙে কাকা বললে, তা তোমার মতো ইয়াংম্যান্‌কে আমি রাখবো কেন হে? আমার এই এত বড়ো ভাইঝি র'য়েছে বাড়ীতে।

নিজের কথা ওঠায় লজ্জা পেয়ে যায় শতদল। কাকাকে ধমক দিয়ে বলে, কাকাবাবু! কী যা-তা কথা বলছো! চুপ করো। কথা কইতে জানো না, কেন মিছেমিছি চেঁচাচ্ছ? তুমি যা ক'রছো তাই করো।

ধমক খেয়ে চুপ হ'য়ে যায় শতদলের কাকা। কাকার দিকে পেছন ক'রে বিজয়কে শতদল পরামর্শ দেয়, আপনি আপনার টাকা দশটা ফেরত চান না! বলুন, আপনারা ঝগড়া-মারামারি করুন, আমি চল্‌লুম।

বিজয় ব'ললে, সেই ভালো।

কতটা জোরে চেঁচিয়ে বললে শতদলের কাকা কথা বুঝতে পারে তার একটা আন্দাজ এতক্ষণে বিজয় ক'রে ফেলেছিল। ঠিক তেমনি জোরে সে বললে, দেখুন, আমার থাকাই যখন এখানে হোল না—দিন আমার টাকা দশটা ফিরিয়ে দিন—আমি অন্য কোথাও চেষ্টা দেখি।

কাকা মহামুস্কিলে পড়ে যায়। বিজয়ের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করে দশটাকা advance দিয়েছ? আমি রেখেছি?

বিজয় বলে, হ্যাঁ ওই পকেটে রেখেছেন, দেখুন হাত দিয়ে।

কাকা পকেট হাত্‌ড়াতে সুরু করে। একটী চালেই কাকা জব্দ হ'য়েছে দেখে শতদলের মুখে আর হাসি ধরে না।

কাকা জিজ্ঞেস করে, হুঁ, খাতায় লেখা হ'য়ে গেছে?

হাসি চেপে শতদল বলে, হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোমার সই পর্য্যন্ত হ'য়ে গেছে।

কাকা তখন কী আর করে? নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে বলতে হোল, টাকা তো তাহ'লে আর ফেরত দেওয়া চলে না। যা দি'গে তু'নম্বর ঘরটা খুলে।

শতদল পা বাড়িয়েই ছিল। কাকার মুখ থেকে কথাটী খ'সতেই সে মুচকি হেসে বিজয়কে ডাকলো—আসুন আমার সঙ্গে।

'আসছি'—ব'লে সুটকেশ বিছানা হাতে নিয়ে বিজয়ও তার পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় চললো।

নীচে থেকে কাকা চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, সিটরেন্ট্‌ সমেত চল্লিশ টাকা লাগবে, ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলিস।

ওপরে উঠ্‌তে উঠতে শতদল বললে, আচ্ছা, আচ্ছা আমি জানি। তুমি থামো।

দুম্‌ দুম্‌ ক'রে শতদল আর বিজয় দোতলায় উঠে যায়। সব বিষয়ে ভাইঝির এই কর্ত্তৃত্ব যেন বাড়াবাড়ি বলে মনে হয় কাকার। সমস্ত দেখে শুনে মেজাজটা তার বিগড়ে যায়। আপন মনেই সে গজ্‌ গজ্‌ করতে থাকে, কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করলুম—সেই মেয়ে আমাকে ধমকায়! বলে কিনা, যা ক'রছো তাই করো!

বলতে বলতে গায়ের জোরে টাইপ করতে লেগে যায় সে—সি, টি, এস্‌—

মাথা গরমের ফলে ভুল হ'য়ে যায় টাইপে। হঠাৎ খেয়াল হ'তেই চীৎকার ক'রে ওঠে: এ-হে-হে-হে, ভুল হ'য়ে গেল।

আঙুলের ডগায় থুতু নিয়ে প্রথমে মুছতে সুরু করে ভুলের জায়গাটা। তারপর তাতেও মুছলো না দেখে প্রাণপণে রবার ঘষতে লাগলো সেখানে। দেখতে দেখতে ফুটো হ'য়ে গেল কাগজটা।—'ধ্যেৎ তেরি' তোর কাগজের নিকুচি ক'রেছে' ব'লে তখন টাইপরাইটার থেকে কাগজটা টেনে খুলে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। তারপর মাথা ঠাণ্ডা করবার জন্যে সে একটা সিগারেট ধরিয়ে হাত-পা গুটিয়ে ব'সলো তার চেয়ারের ওপর।

দোতলার একটা ঘরে এসে বিজয় দেখলো কে একজন মশারির ভেতর শুয়ে শুয়ে খালি হাতে ব্যায়াম করছে। বিজয় আর শতদলকে ঘরে ঢুকতে দেখে কোন কথাবার্ত্তা না ব'লে মশারির ভেতরে থেকেই সে খালি গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে লাগলো।

শতদল হেসে ব'ললে, থাক্ আর গোঁ-গোঁ করতে হবে না। ও-ঘরের চাবিটা নিয়ে গেলাম।

বিছানার তলা থেকে চাবি বে'র ক'রে নিয়ে শতদল চ'লে গেল বাইরে। বিজয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো ঘরের চারিদিকে নানা-ধরণের আজব আজব হিতোপদেশ লেখা। দেওয়ালের মাঝখানে একখানা প্রকাণ্ড সাইজের মহাবীর হনুমানের ছবি। তার আশে পাশে ছোটবড়ো অনেকগুলো হাতে-লেখা কাগজ লটকানো। কোনটায় লেখা: 'ব্যায়াম করিবার সময়ে কথা কহিবে না। ব্যায়ামের পর তিনটি নিমপাতা চিবাইয়া জল খাইবে।' আবার কোনটায় লেখা: 'বিবাহ করিবে না। নারী-জাতিকে মা কিম্বা ভগিনী সম্বোধন করিবে।—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সাম্‌নের দু'নম্বর ঘরের তালা খুলে শতদল ডাকলো, কই আসুন! হাসতে হাসতে ও-ঘর থেকে বেরিয়ে এলো বিজয়। বললে, দেওয়ালের লেখাগুলো পড়ছিলুম।

শতদল বললে, ও-ঘরে আর-একজন আছেন, বেরিয়ে গেছেন বোধ হয়। এক্ষুণি আসবেন।—এই আপনার ঘর। আসুন!

তারা দুজনে ঘরের ভে'তর ঢোকে। বিজয় দেখে একজনের থাকার পক্ষে ঘরটা খুবই খোলামেলা। হাতের স্যুটকেশ-বিছানা নামিয়ে রেখে সে বলে, বাঃ, বেশ ঘর। কিন্তু ওঘরে ব'লছেন দুজন, আর এইঘরে এলাম আমি। এতে আপনাদের লাভ হয় ?

শতদল হেসে বলে, লাভের কারবার আমরা করি না। আর তা'ছাড়া আমার কাকাবাবুও পছন্দ করেন না।

—কী পছন্দ করেন না ? জিজ্ঞেস করে বিজয়।

হঠাৎ এরকম সোজাসুজি প্রশ্নে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে যায় শতদল। তবু সে সামলে নিয়ে বলে, এই এখানে লোকজন রাখতে চান না। শুনলেন তো সব।

যে-কথাটা এড়িয়ে যেতে চায় শতদল, সেই কথাটাই টেনে বে'র করবার জন্যে বিজয় বলে, হ্যাঁ, সেতো আপনার ভয়ে।

শতদল হাল্‌কাভাবে হাতদুটো ছড়িয়ে দিয়ে বলে, আমি কিন্তু ভয়-ডর করি না কাউকে। মেয়ে হ'য়ে জন্মেছি, আমার বাবা প্রায়ই বল'তেন আমি ম'রে গেলে তোকে যেন কা'রও মুখ চেয়ে বসে থাকতে না হয়। সামান্য একটু লেখাপড়া শিখেছি, নার্সিং পাশ ক'রেছি—

—নার্সিং পাশ ক'রেছেন ! গায়ের কোটটা খুলতে খুলতে বিজয় চ'মকে তাকায় শতদলের দিকে।

নখ খুঁটতে খুঁটতে শতদল বলে, হ্যাঁ, মিড্‌ওয়াইফারি পড়বার ইচ্ছে ছিল কিন্তু তার আগেই আমার বাবা—

—মারা গেলেন ? জিজ্ঞেস ক'রে বিজয়।

শতদল ঘাড় নেড়ে বলে,—হ্যাঁ।

শতদলের কথা বলার ভঙ্গী, তার টানা টানা চোখের সলাজ চাউনী ভারী মিষ্টি লাগে বিজয়ের। একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ শতদলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সে বলে, আপনি বেশ মেয়ে—চমৎকার ?

সপ্রতিভ-ভাবে হাত নেড়ে শতদল বারণ করে, বাস্ বাস্ ওই পর্যন্ত, আর না। আমি পালাই।

যাবার মুখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দরকারী কথাগুলো সে জানিয়ে যায় বিজয়কে। বলে, চাকর পাঠিয়ে দিচ্ছি, যা যা দরকার আনিয়ে নিন। চান করতে হ'লে নীচে যেতে হবে। খাবার—বলেন তো এখানেও পাঠিয়ে দিতে পারি, নয়তো নীচে গিয়েও খেয়ে আসতে পারেন।

বিজয়ের দিকে চেয়ে আর একবার অকারণে হেসে ওঠে সে খিল্‌খিল্ ক'রে। তারপর দুদ্দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় একতলায়।

সিঁড়ির মুখেই শতদলকে থম্‌কে দাঁড়াতে হয় হঠাৎ। বংশধরবাবু ওপরে আসছে। প্রকাণ্ড একটা কালো কম্বলের অলেষ্টার গায়ে' মাথায় মঙ্কিক্যাপ, গালে আর গলায় কম্ফার্টার জড়ানো। ভয়ে আর ভাবনায় সবসময়েই যেন জুজুবুড়ী হ'য়ে আছে সে। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ভাঙা কাঁসির মত গলায় সে শতদলকে জিজ্ঞেস করলো, এই ঘরে লোক এলো?

শতদল বললে, হ্যাঁ।

বংশধর অনুযোগ জানালো, এই ঘর আমি চেয়েছিলুম, দাও নি।

—কাকাবাবু তখন ক্লাস করতে চেয়েছিলেন যে! কোনমতে বংশধরের পাশ কাটিয়ে নেমে যেতে পারলে বাঁচে শতদল। পা বাড়িয়ে বলে সে,—আমার কাজ আছে। আমি যাই।

শতদলের পথ জুড়ে দাঁড়ায় বংশধর: ছাখো, সকাল থেকে কপালের এই জায়গাটা একটু টিপ টিপ ক'রছে, ভাত খাব?

শতদল বলে, তা' আমি কেমন ক'রে ব'লবো? আমি তো ডাক্তার নই!—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। বংশধর বলে। ডাক্তারখানা গিয়েছিলাম, ওষুধ দিলে, খুব দামী ওষুধ। খাব?

হাঁ ক'রে বংশধর যেন শতদলকেই কামড়ে খেতে যায়! সিঁড়ির রেলিংয়ে একেবারে কোণঠাসা হ'য়ে দাঁড়াতে হয় শতদলকে। বিরক্ত হ'য়ে সে বলে, আচ্ছা বিপদ তো! আপনার শরীর, আপনার অসুখ আর আমি ব'লে দেবো আপনি ওষুধ খাবেন কি না!

শতদলের কথায় হঠাৎ যেন দুঃখ উথ্‌লে ওঠে বংশধরের। নিজের মনে সে আক্ষেপ ক'রতে থাকে, যাক্‌, তোমার অদৃষ্ট! আমার মনের কথা কেউ বুঝলে না!

বংশধর আর না দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যায়। সুযোগ বুঝে শতদলও তাড়াতাড়ি নেমে যায় নীচের তলায়।

বিজয় এতক্ষণ তার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত লোকটির হাব-ভাব লক্ষ্য করছিল। বংশধর বাবু ওপরে উঠে বিজয়ের আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এলেন এই ঘরে?

বিজয় বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

হঠাৎ হাতের শিশিটা দেখিয়ে বংশীধর বিজয়কে জিজ্ঞেস করলো, ওষুধ যে খাব, তা এই ওষুধের সঙ্গে যে বিষ মিশিয়ে দেয় নি তা আমি জানবো কেমন ক'রে!

বিজয় হেসে বললে, বিষ কেন মিশিয়ে দেবে? তাই দিতে পারে কখনও? বংশধর জোর দিয়ে বললে, পারে পারে, খুব পারে। আমার ভাইপোদুটিকে আপনি চেনেন না, তাই বলছেন। ঘরে চলুন, বলছি সব কথা।

বিজয়ের ঘরে ঢুকে বংশধর ব'লতে সুরু করে, আমার ভাইপো দুটো হয়তো আমাকে দেখিয়ে ওষুধের দোকানে ব'লে দিয়ে গেছে, ওই লোকটা যদি কোনদিন ওষুধ নিতে আসে, দেবে বিষ মিশিয়ে। সেই ওষুধ খেয়ে আমি ম'রে যাব, বাস্‌, আমার টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি সবই তারা পেয়ে যাবে।

—কেন, আপনার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ?—জিজ্ঞেস করলো বিজয়।

হতাশ হ'য়ে বংশধর বললে, না, আপনার চেহারাটি ভাল, কিন্তু বুদ্ধি ভারি মোটা ; মাথায় কিছু নেই।

বিজয় হেসে বললে, কেন বলুন তো ?

হাতমুখ নেড়ে বংশধর বললে, আমার স্ত্রী নেই, ছেলেমেয়ে নেই, কেউ কোথাও নেই। ছিল। একটি মেয়ে ছিল, সেও ম'রে গেল।

বিজয় বললে, তাহ'লে তো আইনতঃ ভাইপোরাই সম্পত্তি পাবে ?

মহা খাপ্পা হ'য়ে গেল বংশধর : পাবে ? পাবে বললেই পাবে ? আমি দেবো না। কিছুতেই দেব না। কেন দেবো।

তারপর নিজের অলেষ্টারের বোতাম খুলতে খুলতে সে বিজয়কে বললে, আসুন, দেখবেন আসুন।

—কী দেখ্‌বো ? জিজ্ঞেস করলো বিজয়।

বংশধর বললে, বাণ মেরেছে।

—বাণ মেরেছে ! বিস্ময়ের আর শেষ থাকে না বিজয়ের।

বংশধরও পরম উৎসাহে গায়ের জামা খুলে খুলে দেখায় : হ্যাঁ, বাণ মেরেছে এইখানে, এইখানে আর এই পেটে। শরীরটাকে একেবারে জেরবার ক'রে দিলে !

অবিশ্বাসের সুরে বিজয় বলে, বাণ মেরেছে কি মশাই ?

বিজয়ের প্রশ্ন শুনে গা জ্বলে যায় বংশধরের : জানেন না, বাণ মারা কাকে বলে ?

বিজয় বলে, না।

বংশধর গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করে, বাড়ী কোথায় ? সহরে, না—

বিজয় বলে, পাড়াগাঁয়ে।

পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, অথচ বাণ মারা কা'কে বলে জানে না—এমন লোককে কী ব'লে ধিক্কার দেবে ভেবে পায় না বংশধর। কট্‌মট্

ক'রে বিজয়ের দিকে একবার তাকিয়ে সে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

বিজয় তাকে চ'লে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করে, চললেন ?

যেতে যেতে একবার মুখ ফিরিয়ে বংশধর বলে, হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে কথা বলা চলে না।

বংশধর ঘর থেকে বেরুতেই দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিল বিজয়, এমন সময় চাকর এলো চায়ের কাপ হাতে নিয়ে। চা দেখে প্রথমেই হাত বাড়ালো বংশধর : দিদিমণি পাঠিয়ে দিলে বুঝি ?

বোবা চাকর, কথা বলতে পারে না। হাত মুখের ভঙ্গী ক'রে সে বিজয়কে দেখিয়ে দিল। বংশধর বুঝলো বিজয়ের জন্যই চা এসেছে। চায়ের কাপটা বিজয়ের হাতে এগিয়ে দিল সে : নিন, আপনার চা।

ভদ্রতা দেখিয়ে বিজয় বললে, আপনিই খান না।

চা খাবে কি ? সমস্ত কাণ্ডকারখানা দেখে বংশধরের মাথায় তখন আগুন ছুটছে। 'না' ব'লে আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা না ক'রে সে চ'লে গেল সেখান থেকে।

নীচের ঘরে প্যাণ্টের দু'পকেটে দুহাত ঢুকিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে পায়চারি করছিল শতদলের কাকা। বংশধর এলো তারি' কাছে নালিশ জানাতে।

পট্পটি বাবু! পট্পটি বাবু ! ডাকতে ডাকতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো বংশধর। কাকা ঘাড় ফিরিয়ে বংশধরের দিকে দেখে বললে, কী বললে ? পট্পটি ?

বংশধর বললে, হ্যাঁ।

—আমার নাম পট্পটি ? কপাল কুঁচ্‌কে জিজ্ঞেস করলো কাকা।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল বংশধর। নিতান্ত ভালোমানুষের মত প্রশ্ন করলো, তবে কী ?

বুড়ো হ'তে চ'লেছে অথচ পট্‌পটি যে কারও নাম হ'তে পারে না এটুকু বুঝবার মতো সাধারণ বুদ্ধিও বংশধরের নেই দেখে চ'টে যায় শতদলের কাকা। বুঝিয়ে বলে, টাইপ-মেশিনগুলো পট্‌ পট্‌ ক'রে আওয়াজ করে—তাই পাড়ার ছেলেগুলো 'চট্‌পটি' 'পট্‌পটি' ব'লে আমাকে রাগায়, তাই ব'লে তুমিও—মানে আপনিও ব'লবেন ?

ঘাট স্বীকার করতে হয় বংশধরকে : বেশ তা ব'লবো না।—কিন্তু ওই যে ওপরের ঘর আমি চাইলাম, আমাকে তখন দিলেন না, আর এখন দেখছি খুলে দেওয়া হোলো।

কথাটা ঠিক শুনতে পেল না পট্‌পটি। মাথা ঝাঁকুনী দিয়ে বললে, না না, ওপরের ঘরে খাবার পাঠাবার নিয়ম নেই। নীচে এসে খেয়ে যেতে হবে।

ব'লেই সে এগিয়ে চ'ললো নিজের মনে। বংশধর বুঝলো কালা-মানুষের সঙ্গে কথা বলা কী ঝক্‌মারি! তবু ব্যাপারটার একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। তাই পট্‌পটির পিছু নিল সে, বলি ও পট্‌পটিবাবু, শুনুন—শুনুন!

পট্‌পটি আবার ফিরে দাঁড়ালো, কী ?

বংশধর বললে, ঘর না-হয় থাকগে, কিন্তু চা ? আজ যে চা পর্য্যন্ত গেল নীচে থেকে!

—কী বললে ? চা ? কাণখাড়া ক'রে জিজ্ঞেস করলো পট্‌পটি। চা-এর কথাটা কানে ঢুকেছে দেখে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লো বংশধর। আগ্রহের সঙ্গে আবার বললে, হ্যাঁ, চা।

কিন্তু ঐ চা পর্য্যন্তই! চা ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায় নি পট্‌পটি। বংশধরের মুখ-চোখের ভাব লক্ষ্য ক'রে সে যা বুঝলো তাতে বেশ আত্ম-প্রসাদের সঙ্গেই সে বললে, ভালো তো হবেই। নগেন্দ্র কেবিনের চা, ভালো হবে না ? আমার নাম ক'রবেন, দুধচিনি একটু বেশি ক'রে দেবে।

দাঁত বের করে হাসতে হাসতে চলে গেল পট্‌পটি।

বংশধর দেখলো এমন লোকের সঙ্গে কথা বলা নিতান্তই পণ্ডশ্রম। এককথা ব'ললে সে আরেক কথার জবাব দেয়। নালিশটা-ই যার কানে ঢোকেনা, তার কাছে সুবিচারের আশা করা দুরাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই আর পট্‌পটির পিছু পিছু না ঘুরে হতাশ মনে ফিরে যাচ্ছিল বংশধর। সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই শতদল তাকে পিছু ডাকলো, বংশধরবাবু!

পিছন ফিরে শতদলকে দেখেই থ'মকে দাঁড়ালো বংশধর। বংশধরের মুখচোখের বিরক্ত ভাবটা শতদলের নজর এড়ালো না। আড়াল থেকে কাকার সঙ্গে বংশধরের কথাবার্ত্তা সবই শতদল শুনেছিল। বংশধরের কাছে এগিয়ে এসে সে জিজ্ঞেস করলো, কী, সহ্য হ'চ্ছে না?

মনের দুঃখে গাল ফুলিয়ে বংশধর বললে, না। আমি আর কাউকে কিছু বলব না। আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ।

শতদলও জানতো যে দুরদৃষ্ট না হ'লে অনর্থক বংশধরের মতো সাধ ক'রে কেউ এত দুর্ভোগ ভুগতে পারে না। গরমের দিনে গরমজামা-কাপড়ে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে থাকলে সুস্থ মানুষেরও মাথা খারাপ হ'য়ে যায়। বংশধরের জামাকাপড়ের বোঝার দিকে আঙুল দেখিয়ে সে তাই বললে, তাতো বুঝতেই পারছি। অদৃষ্ট মন্দ না হ'লে এই গরমে কেউ এইসব পার কখনও?

জামাকাপড়ের কথায় বংশধরের দুঃখ আবার উথ্‌লে উঠলো: কেন যে পরেছি জিজ্ঞাসা করবার লোকটি পর্য্যন্ত নেই। রাত্তিরে জানলা খুলে ঘুমিয়েছিলাম, সকালে দেখি—ঠাণ্ডা লেগেছে।

কথাটা বলেই বংশধর একবার শতদলের মুখের দিকে চাইলো, যদি একটা সহানুভূতির কথা তার মুখ থেকে বেরোয়। কিন্তু শতদল কিছুই বলছে না দেখে হঠাৎ নিজের মনেই সে বলে উঠলো, না, আমি আর এখানে থাকবো না, চ'লেই যাব।

—চ'লে যাবেন? এমন অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলো শতদল, যে মনে হোল বংশধর চ'লে গেলে তার বিশ্বসংসার একেবারে অন্ধকার হ'য়ে যাবে। বংশধর কিন্তু ততক্ষণে চ'লে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। শতদলের কথার জবাব না দিয়েই কয়েক পা' এগিয়ে গেল সে। যেতে যেতে হঠাৎ তার কী হোল, দু'হাতে পেট চেপে ধ'রে 'উঃ' ব'লে চীৎকার ক'রে সে ব'সে পড়লো একেবারে।

'কী হোল' ব'লে শতদল তাড়াতাড়ি ছুটে গেল তার কাছে। কাৎরাতে কাৎরাতে কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে বংশধর বল্‌লে, মেরেছে। আবার বাণ মেরেছে।

বাণ মেরেছে কিনা ভগবান জানেন, তবে বংশধরকে দেখে মনে হ'চ্ছিল যেন ভেতরে ভেতরে একটা অসহ্য যন্ত্রণা হ'চ্ছে তার। কিছুতেই সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। কোনমতে ট'লতে ট'লতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো সে।

বংশধরের জন্যে সমবেদনা হওয়া দূরের কথা, মিথ্যে আতঙ্কেই লোকটা ছটফট ক'রছে দেখে শতদল আর হাসি চেপে রাখতে পারলো না। বংশধরের দিকে চেয়ে চেয়ে নীচে দাঁড়িয়ে সে হাসতে লাগলো হি হি ক'রে।

সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে বংশধর দেখে তার রুম-মেট্ কানু তড়্‌বড়িয়ে কোথায় যেন চ'লেছে। বংশধরের সঙ্গে মুখোমুখি হ'তেই একগাল হেসে কানু জিজ্ঞেস করলো, কোথায় গিয়েছিলেন?

একে পেটে বাণমারার যন্ত্রণা, তার ওপর কানুর দাঁত বে'র-করা হাসি, দেখে শুনে গা জ্ব'লে যায় বংশধরের। মুখ গম্ভীর ক'রে সে বললে, আপনি আর আমার সঙ্গে কথা বলবেন না।

কানুর তবু লজ্জা নেই। ন্যাকার মতো সে জিজ্ঞেস করলো, কেন, এত রাগ কেন?

রাগ যে কেন তা' কান্নুর না জানার কথা নয়। কান্নু বলেছিল তার জানাশোনা একজন রোজা আছে, তুক্ তাক্ ক'রে সে বংশধরকে বাণ-মারার হাত থেকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু তাকে নিয়ে আসার আর নাম নেই কান্নুর। ক্ষোভের সঙ্গে তাই বংশধর বললে' আপনি যে রোজার কথা ব'লেছিলেন্ আন্‌লেন কই তাকে ?

মাথা চুলকে কান্নু বললে, অনেক টাকা চায় যে !

টাকা খরচ করতে বংশধরের আপত্তি নেই। যন্ত্রণাটা দূর হ'লেই হোল। কান্নুকে সে কথা দিল, তা কাজটি যদি ক'রে দিতে পারে তো দেবো টাকা।

কান্নুও এই টাকার পাকাপাকি করার অপেক্ষাতেই ছিল। সে বংশধরকে ভরসা দিয়ে বললে, ব্যাস্, এইবার একদিন ডেকে আনবো।

টাকার কথা ঠিক হয়ে গেল, তবু যে কান্নু কেন একদিন-একদিন করছে—এখনও তাড়াতাড়ি দিনটা ঠিক করে ফেলছে না, তা বংশধর বুঝে উঠতে পারেনা। সে মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বললে, আবার একদিন কেন ? তার আগে ম'রেই যদি গেলাম—

কান্নু বাধা দিয়ে বললে, না না মরবেন কেন, মরবেন না।

কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বংশধর বললে, ম'রতে কি আর বাকি আছে ? বাণ মেরে মেরে দিলে দেহটাকে জেরবার ক'রে।

বুকে তাল ঠুকে কান্নু বললে, মারুক না বাণ,—কত মারবে ! আমিও রোজা ডেকে আনছি। আমরা কামান দাগবো।

শতদল ওপরে আসছিল। কান্নুর আস্ফালন দেখে সে দাঁড়িয়ে গেল। শতদলকে দেখে কান্নুও তাড়াতাড়ি সামরিক কায়দায় অভিবাদন করলো তাকে, এই যে ভগিনী, 'জয় হিন্দ !

'জয় হিন্দ' ব'লে শতদলও প্রত্যভিবাদন জানালো। তারপর হাসতে হাসতে সে জিজ্ঞেস করলো, হঠাৎ এত কামান দাগছেন কেন ?

কানু বললে, বা-রে! আমাদের বংশধরবাবুকে বাণ-মারবে, আর আমরা কামান দাগবো না?

বংশধরের দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে শতদল কানুকে বললে, কিন্তু উনি তো আমাদের ওপর রাগ ক'রে চ'লেই যাচ্ছেন এখান থেকে।

শতদলের কথা শুনে কানু যেন আকাশ থেকে পড়লো। সে বললে, সেকি বংশধরবাবু, যাবেন কোথায়? যেতে আপনাকে দেবে কে?

মুখ গোমরা ক'রে বংশধর বললে, হ্যাঁ, আমি চ'লেই যাব।

বংশধরের অতিরিক্ত গাম্ভীর্য দেখে হেসে ফেললো শতদল। কানুকে ডেকে বললে, ঐ শুনুন!

কানু দেখলো শতদল যখন বংশধরের পেছনে লেগেছে তখন আর তার নিজের এখানে না থাকলেও চলে। কানুর বেরোতে দেরী হ'য়ে যাচ্ছিল, সে তাই হাসতে হাসতে চ'লে গেল তাড়াতাড়ি।

কানু চ'লে যেতে শতদলও পা বাড়ালো বিজয়ের ঘরের দিকে। বংশধরকে শুনিয়ে শুনিয়ে নিজের মনে সে বললে, আমি এখন বিজয়বাবুর কাছে যাচ্ছি।

বিজয় বাবু! বিজয় বাবু! ব'লে সত্যি সত্যিই বিজয়ের ঘরে গিয়ে ঢুকলো শতদল। বিজয়ের ওপর শতদলের এত টান, অথচ বংশধরবাবুর সঙ্গে হাসিমুখে দুটো কথা বলারও সময় হয় না তার—এতে কা'রই বা না রাগ হয়?

—না, আর এখানে থাকা চলে না। ব'লে নিজের মনে গজরাতে গজরাতে বংশধর গিয়ে নিজের ঘরে ঢোকে।

এদিকে শতদল এসে ঢোকে বিজয়ের ঘরে। বিজয় তখন তার স্যুটকেশ থেকে জিনিষপত্র বে'র করছিল। মনে মনে একটা মত্‌লব ভেঁজে শতদল তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, আপনার বিয়ে হ'য়েছে বিজয়বাবু?

হঠাৎ এমন প্রশ্নে চ'মকে উঠলো বিজয়ঃ উঁ!

ফিস্ ফিস্ ক'রে শতদল তাকে পরামর্শ দিল, বলুন—হয় নি।

তারপর বেশ জোরে জোরেই আবার প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করলোঃ ব'লছি, আপনার বিয়ে হ'য়েছে?

শতদলের শেখানো জবাবই আউড়ে গেল বিজয়, না হয় নি।

—বিয়ে করবেন তো? হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো শতদল।

বিজয় বুঝলো নিশ্চয়ই কাউকে রাগাবার জন্যে এইসব কথা শোনাচ্ছে শতদল। কী মজা হয় দেখবার জন্যে বিজয়ও শতদলের ষড়যন্ত্রে যোগ দিল। গম্ভীরতার ভাণ করে বললে, তা' মনের মতো মেয়ে যদি পাই করতে পারি।

শতদল বললে, মনের মত?—তা ধরুন, আমার মত হ'লে চ'লবে? এমন অবাধে শতদলকে এসব কথা বলতে দেখে হেসে ফেললো বিজয়।

পাশের ঘরে ততক্ষণে ওষুধের ক্রিয়া সুরু হ'য়ে গেছে। আধেক-খোলা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বংশধর এতক্ষণ কান পেতে সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনছিল। কোথাকার কে এক ছোকরা, বাড়ীতে আসতে না আসতেই একদিনে শতদল তার সঙ্গে এমন প্রেমালাপ জমিয়ে তুলবে—এ একেবারে অসহ্য লাগছিল তার কাছে। নিজের ওপর ঘেন্নায়-ধিক্কারে সে যে কী ক'রবে ভেবে পাচ্ছিল না। রাগের মাথায় নিজের হাতের ওষুধের শিশিটাই সে আছাড় মেরে ভেঙে ফেললো।

সংসারে কোথায় কী ঘটছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার ফুরসুৎ নেই, পটুপটিবাবুর। সারাদিন তার কমার্শিয়াল কলেজ নিয়েই মেতে আছে সে। নীচের তলায় তার ক্লাস বসে। তার ধারণা তার মতন টাইপ্ বিশারদ ভূ-ভারতে আর নেই। 'A' থেকে 'Z' পর্যন্ত একসঙ্গে টাইপ করবার একটা নতুন 'ফরমূলা' সে আবিষ্কার করেছে। রোজই একই কথা সে প্রত্যেক ছাত্রকে টাইপ করতে বলে। সে বলে, প্রত্যহ একশো-আটবার ক'রে তিনমাস ধ'রে এই 'ফরমূলা'টা প্র্যাকটিশ্ করলে পঞ্চাশ

টাকা মাইনের একটা চাকরী কেউ আর ঠেকাতে পারবে না। ফরমূলাটাও খুবই সোজা: A quick brown fox jumps right over a lazy dog. 'A' থেকে 'Z' পর্য্যন্ত সব কটা অক্ষরই এতে সাজানো আছে।

ছাত্রেরা সবাই চাকরীর আশায় পাতার পর পাতা এই 'ফরমূলা'ই টাইপ্ ক'রে যায়। পটপটি দেখে, সব ছাত্রই তার ক্লাস ক'রতে আসে, আসে না শুধু সেই নতুন ছাত্রটি। পট্পটিবাবুর নামডাক শুনে দেশ থেকে সে ক'লকাতায় এসেছে, অথচ ক্লাসে যে কেন তার আসবার নাম নেই তা ভেবেই পায় না পট্পটি। দু'চার দিন যাবার পরে সে শতদলকে ডেকে বললে, দ্যাখ্ তো শতদল, সেই নতুন ছেলেটি ক্লাসে আসে না কেন? বিজয়ের কাছে যাবার জন্যে শতদল তো সবসময়ে পা বাড়িয়ে আছে।

'দেখি' ব'লে তাড়াতাড়ি সে বিজয়ের খোঁজ করতে চললো।

ওপরে গিয়ে শতদল দেখে দরজা বন্ধ ক'রে বংশধরের ঘরে তখন তুমুলকাণ্ড চ'লেছে। ধূপের ধোঁয়ায় সারাঘর অন্ধকার। ঘরের মাঝখানে বংশধরকে খালি গায়ে দাঁড় করানো হ'য়েছে। বংশধরের কোমরে মোটা একটা দড়ি বেঁধে সেই দড়ি ধ'রে ব'সে আছে কানু, আর এক জটা-ত্রিশূল-ধারী কিম্ভূত কিমাকার সন্ন্যাসী বংশধরের চারপাশে ঘুরে ঘুরে চিমটে বাজিয়ে তাণ্ডবনৃত্য লাগিয়ে দিয়েছে। যেমন তার নৃত্য, তেমনি তার মন্ত্র-তন্ত্র! কান ফাটানো চীৎকার ক'রে কী-যেন সব শ্লোক আওড়াচ্ছে সে:

—চলি যা চলি যা একদম চলি যা।
ভাগে পিরেত্, ভাগে ভূত, আর ভাগে পিরেতের মা।
বাণ মারে, বর্শা মারে আর মারে সরষে ফুল।
আর আমি সে ভূতের পেটে মারলাম ত্রিশূল॥
কার আজ্ঞা? বোম্ বোম্ ভোলানাথ, আর
কাউর কামাখ্যা মা!
চলি যা চলি যা একদম চলি যা।...একদম চলি যা।

খানিকক্ষণ জানলার ফাঁক দিয়ে এই সব ভুতুড়ে ক্রিয়াকাণ্ড দেখলো শতদল। এমন হট্টগোলের ভেতরেও বিজয় যে পাশের ঘরে চুপচাপ ব'সে আছে কেমন ক'রে তা সে বুঝে উঠতে পারলো না। বিজয় কী করছে দেখবার জন্যে দরজা ঠেলে শতদল বিজয়ের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

বিজয় কী-যেন লিখছিল ঘরে ব'সে। শতদল ঘরে ঢুকতেই চমকে উঠলো সে : কে ?—ও তুমি !

'তুমি ব'লেই আবার তাড়াতাড়ি সে শুধ্‌রে নিল,—আপনি হঠাৎ ?'

শতদল বললে, 'তুমিই বলুন না। আমি আপনার চেয়ে অনেক ছোট।' চলুন—কাকাবাবু ডাকছে। কলেজে ভর্তি হ'য়েছেন, ক্লাস করবেন চলুন।

বিজয় হেসে বললে, আজ থাক্‌।

বিজয় একটু ঘুরে ব'সতেই শতদল দেখলো বিজয়ের গলায় একগাছা ফুলের মালা।...সে জিজ্ঞেস ক'রলো, গলায় ফুলের মালা কেন ?

বিজয়ের খেয়ালই ছিলনা তার গলায় ফুলের মালা রয়েছে। তাড়াতাড়ি মালাটী খুলতে খুলতে সে বললে, ওই যে ওই ঘরের কানুবাবু পরিয়ে দিয়ে গেলেন। খুলে রাখতে ভুলেই গেছি।

হঠাৎ কী দুষ্টুবুদ্ধি এলো শতদলের মাথায় ! বিজয়কে সে বাধা দিয়ে বললে, থাক্‌ থাক্‌, খুলবেন না, খুলবেন না।

—কেন ? জিজ্ঞেস করলো বিজয়।

শতদল বললে, আছে—কাজ আছে। ওঘরে কী হ'চ্ছে দেখলেন না ?

বিজয় বললে, দেখলাম তো সন্ন্যেসীর মতন কে একজন এলো।

শতদল হেসে বললে, রোজা—রোজা। ভূত ছাড়ানো হ'চ্ছে।—দেখুন, আপনার ঘাড়ে যদি ভূত-টুত চ'ড়ে থাকে তো এই সময় ছাড়িয়ে নিতে পারেন।

—ভূত কিন্তু মেয়েদের ঘাড়েই বেশি চাপে। বিজয়ও ঠাট্টা করতে

ছাড়ে না। শতদল জবাব দেয়, সে ভূতকে খ্যাংরা মেরে কেমন ক'রে ছাড়াতে হয় সে-বিদ্যেও মেয়েদের জানা আছে।—এখন দয়া ক'রে একবার উঠুন তো দেখি !

—কোথাও যেতে হবে ? জিজ্ঞেস করে বিজয়।

—বেশি দূর নয়, এই বারান্দায়। হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয় শতদল।

কী-হয় দেখার জন্যে বিজয়ও শতদলের কথামতো তার পিছু পিছু বারান্দার দিকে যায়।

বংশধরের জানলার সামনে গিয়ে শতদল চুপি চুপি বিজয়কে বললে, দোহাই আপনার, দুটি পায়ে পড়ি বেশি চেঁচামেচি করবেন না। আপনি শুধু ওই বংশধরবাবুকে দেখিয়ে দেখিয়ে আপনার গলার মালাটি আমার গলায় পরিয়ে দিন।

বিজয় বুঝলো বংশধরকে ক্ষেপাবার জন্যে এ এক নতুন ফন্দী বের করেছে শতদল। হাসতে হাসতে সে বললে, ওকে তোমরা পাগল না ক'রে ছাড়বে না দেখছি। এই নাও।

সরল মনেই সে শতদলের গলায় মালা পরিয়ে দিল। বংশধরের জানলার কপাটটা ভালো ক'রে খুলে দিয়ে শতদল বললে, আস্তে আস্তে দেখিয়ে দেখিয়ে পরিয়ে দিন।

বিজয় শতদলের গলায় মালা পরাচ্ছে দেখে বংশধরের তো চক্ষুস্থির ! নিরুপায় ভাবে সে কানুর শরণ নিল : কানুবাবু, ওই দেখুন।

কানু ব্যাপারটা দেখতে পেয়েই ছুটে এলো শতদলের কাছে : ভগিনী, ভগিনী ! ওকি হোলো ? মালাবদল হ'য়ে গেল যে ! মালাটা খুলে ফেল।

শতদল কিন্তু দু'হাত দিয়ে মালাটা চেপে ধরলো বুকের ওপর। মাথা ঝাঁকুনী দিয়ে বললে, না খুলবো না।

পাছে কেউ মালাটা টেনে খুলে ফেলে সেই ভয়েই যেন সে একছুটে পালিয়ে গেল সবার সামনে থেকে।

একতলায় নিজের ঘরের নিরালা কোণে এসে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে দেখতে লাগলো মালাটীকে। কখনো তাকে বুকে চেপে, কখনো গালে ছুঁইয়ে, কখনো বা তার গন্ধ শুঁকে সে যেন একটা অজানা আনন্দে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠতে লাগলো। নারীজীবনের সবচেয়ে মধুর স্বপ্ন বোধহয় একগাছি ফুলের মালার ভেতরেই লুকোনো থাকে। তাই বিজয়ের বুকের মালা নিজের বুকে জড়িয়ে সারা হৃদয়ের তৃষ্ণা যেন জুড়িয়ে গেল শতদলের। বংশধরকে উপলক্ষ্য ক'রে বিজয়ের যতখানি সান্নিধ্য সে পেয়েছে তারই তৃপ্তিতে গুন্‌গুনিয়ে গান গেয়ে উঠলো সে।

শতদলের মনের খবর জানবার আগ্রহ বা অবসর বিজয়ের ছিল না। ছল-চাতুরী যে শুধু বংশধরকে জ্বালাতন করবার জন্যেই নয়, হাসি-তামাসার ভেতর দিয়ে আরেকটী মনেও যে রঙ্ ধরাতে চায় শতদল, বিজয় তা জেনেও না জানার চেষ্টা ক'রছিল। বিজয়ের স্ত্রী আছে, সে তাকে খুব ভালোও বাসে। কাজেই নতুন ক'রে কারো সঙ্গে প্রেমে পড়ার আর শখ ছিল না তার। সে শুধু অবাক হ'য়ে দেখছিল, কী বিচিত্র এই বোর্ডিং-বাড়ীটী। পট্‌পটি, বংশধর, কানু সবাই যেন এক একটি চিড়িয়াখানার জীব। যেমন এখানকার মানুষগুলি, তেমনি উদ্ভট এখানকার ব্যবস্থা! নীচে একদিকে আছে টাইপরাইটিং কলেজ—আর একদিকে পাইস হোটেল। পাইস হোটেলটি তো লোকজনের আনাগোনা আর চাকরবাকরের হাঁকডাকে সব সময়ে গুলজার হ'য়েই আছে।

টেবিলের পাশে-পাশে বেঞ্চি পাতা, চাকরেরা সেখানে পরিবেশন ক'রছে। ভাত-তরকারী যেমন যেমন দিচ্ছে, তেমন তেমন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে তারা। কেউ বলছে, তিন নম্বর আলুভাজা চারপয়সা। কেউ বা হাঁক্‌ছে, সাত নম্বর মুড়িঘণ্ট—তিন আনা।

দরজার কাছে একটী লোক টেবিল-চেয়ার পেতে খাতা-পেন্সিল নিয়ে

ব'সে আছে। দুটী কাণ তার সব সময়েই খাড়া হ'য়ে আছে, চাকরদের একটী কথাও যাতে না ফস্‌কায়। শুনবামাত্র খাতার নম্বরে নম্বরে ভাত-ডালের হিসেব টুকে যাচ্ছে সে। যাদের খাওয়া শেষ হ'চ্ছে হিসেব মতন তাদের কাছ থেকে সে দাম আদায় করছে। কিন্তু একা লোক, কত আর চারিদিকে নজর রাখবে সে। শত চেষ্টা ক'রেও এক কানুর সঙ্গেই সে পেরে ওঠে না। ফাঁকি দিয়ে খেয়ে যাবার নিত্য নতুন ফন্দী বের করে কানু।

রোজ যেমন খায় সেদিনও এক কোণে ঘাপ্‌টি মেরে ব'সে খেয়ে যাচ্ছিল কানু। চাকরদের পাঁচমিশেলী চীৎকারও চ'লছিল সমানে: ন' নম্বর ডাল তিন পয়সা—দু'দফা, একুশ নম্বর দই চাইছে, সতের নম্বর চিংড়িমাছ—সাত পয়সা।

ক্যাশিয়ার-বাবু হিসেবটা তো লিখছেই, ওদিকে নামতা পড়ার মত ক'রে হিসেব পড়ে পড়ে লোকের কাছ থেকে দাম জমা নিচ্ছে, মাঝে মাঝে আবার চাকরদের ওপর এটা-সেটা হুকুম চালাচ্ছে। একসঙ্গে চার-পাঁচজন এলো তার কাছে পয়সা দিতে। তেইশ-নম্বরে যে খেয়েছে সে তাকে এক টাকার একটা নোট দিল। গুণে গুণে তাকে পয়সা ফেরত দিল ক্যাশিয়ার: তেইশ-নম্বর, আপনার সাত আনা হ'য়েছে, ফেরত্‌ ন' আনা! ধরুন।

তারপর একে একে পাঁচ নম্বরের বারো আনা, সাত নম্বরের সাড়ে সাত আনা জমা নিতেই কানু এসে মুখ মুছতে মুছতে দাঁড়ালো। বললে: উনিশ নম্বরটা ছাখো।

ক্যাশিয়ার খাতা দেখে বললে, উনিশ নম্বর তিন আনা।

মুখ তুলে কানুকে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো, এত কম খেলেন কেন?

তাড়াতাড়ি তিন আনা পয়সা বে'র করে দিয়ে কানু বললে, যে ঝাল ঠুকছো, বেশি খাবার জো কি?

দামটা দিয়েই কানু স'রে পড়তে চেষ্টা করে। ক্যাশিয়ার তাকে পিছু ডেকে তাগাদা দেয়, কানুবাবু, আপনার পেছ্‌লি বাকি চারটাকা দু' আনা, অনেক দিন হ'য়ে গেল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে কানু জিজ্ঞেস করে, কত বললে?

ক্যাশিয়ার আবার বলে, চার টাকা দু' আনা।

নেহাৎ ভালমানুষী দেখিয়ে কানু বলে, যাক খুব মনে পড়িয়েছ। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে পয়সার বাটি থেকে গুণে গুণে পয়সা তুলে নেয় কানু। বলে, এই আট আর চার—বারো আর দুই চোদ্দ—মোট চোদ্দ আনা নিলাম তাহ'লে।

—তার মানে? ক্যাশিয়ার অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করে।

হাসতে হাসতে কানু তাকে বুঝিয়ে দেয়: ভাঙাভর্ত্তি আর কেন দাদা, চার টাকা দু' আনা আর এই চোদ্দ আনা, একেবারে পুরোপূরি পাঁচ টাকা দিয়ে দেবো।

পয়সা চোদ্দ-আনা পকেটে ফেলে কানু কেটে পড়ে সেখান থেকে।

কানুর চালাকী দেখে হাঁ হ'য়ে যায় ক্যাশিয়ারবাবু। কিন্তু জায়গা থেকে নড়বার সময় নেই তার। দু'তিনজন খ'দ্দের এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাকে। একজন এসে দাঁড়ালো: উনিশ নম্বর।

ক্যাশিয়ার বললে, আপনার নম্বর ভুল হ'য়েছে। উনিশ নম্বর পয়সা দিয়ে গেছে তিন আনা।

পরের লোকটীর পয়সা নিতে নিতে প্রথম লোকটীকে দেখিয়ে ক্যাশিয়ার হাঁকলো, ভজু, এঁর নম্বর কত?

চাকর ভজু চেঁচিয়ে বললে, উনিশ। তিন আনা

ক্যাশিয়ার বললে, উনিশ তিন আনা তো আমাদের কানুবাবু দিয়ে গেল।

ভজু বললে, কানুবাবু কুড়ি নম্বরে খেয়েছেন তেরো আনা।

কথাটা শুনে একেবারে বেকুব ব'নে গেল ক্যাশিয়ার। কী আর কর্বে ? উনিশ নম্বরের আসল খদ্দেরটীকে সে বললে, দিন আপনি তিন আনাই দিয়ে যান।—

তারপর চাকর ভজুকে ডেকে সে হুঁসিয়ার ক'রে দিল, কাল থেকে কানুবাবুকে আলাদা বসাবি। একটু নজরে নজরে রাখবি।

কিন্তু কুবুদ্ধিতে কানুর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া বড় সোজা কথা নয়। দিনরাত সে পরের মাথায় হাত বুলোবার ফন্দী ফিকিরেই ঘোরে। এই বংশধরবাবুকে রোজা দেখানোর ব্যাপারটাই কি তার কম বুজরুকী! রোজা নয়, কোথাকার এক জোচ্চোরকে ধ'রে এনে বংশধরের কাছ থেকে বেশ কিছু মোটা টাকা খসাবার তালে ছিল সে। স্রেফ রোজা ডেকে দেবার নাম ক'রেই তো একশো টাকা সে বংশধরের কাছ থেকে আদায় করেছে, ওদিকে আবার রোজার পাওনাগণ্ডা থেকেও তার বখ্‌রা নেওয়া চাই। রোজা তো কিছুতেই ভাগ দেবে না। কিন্তু কানু ছাড়বার পাত্র নয়। দস্তুরী-আদায়ের জন্য রোজার বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া ক'রলো সে। রোজার সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত কানুর বচসা সুরু হ'য়ে গেল। রোজা বলে, না—না না,—যা হয় না, তা হবে না, তাই নিয়ে কেন চেঁচাচ্ছিস্ বল্ দেখি! আমার টাকা থেকে তোকে আমি একটি পয়সা দিতে পারবো না।

—সব টাকা তুই একাই নিবি ?—কানু জিজ্ঞেস করে।

রোজা বলে, নোবো না ? তুই যদি ফোকোট্‌সে আমাকে শুধু ডেকে দেবার জন্যে একশো টাকা নিতে পারিস, আর আমার এত ঝঞ্ঝাট ঝামেলা, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মুখে রক্ত উঠে গেল, আর তা'ছাড়া এই চুল !—মাথা থেকে পরচুলোটা খুলে টাক চুল্‌কোতে চুলকোতে সে বললে,—টাকের ওপর কুট্‌কুট করছে তো ক'রছেই। ছারপোকা ঢুকলো কিনা তাই বা কে জানে! আর তার জন্যে দু'শ টাকা কি খুব বেশী হোল নাকি ?

কানু বাধা দিয়ে বলে, দু'শো মানে? তিনশ' টাকা।

রোজা বলে, আরে বাবা আজকের একশো টাকা তো বশীকরণের জন্যে।

—বশীকরণ! অবাক হ'য়ে রোজার মুখের দিকে চাইলো কানু। এ-ব্যাপারটার কথা আগে কিছু শোনে নি সে।

রোজা বললে হ্যাঁ-হ্যাঁ, বশীকরণ। তোদের হোটেলে ওই যে মেয়েটি আছে না, ওকে বশ ক'রে দিতে হবে।

—বিয়ে থা করবার মতলব আছে নাকি বংশধরের? জিজ্ঞেস করে কানু।

রোজা বলে না না সে সব কিছু নয়। বেচারা বলতে বলতে কেঁদে ফেললে। বললে—সারাজীবনে কোন দিন কোন মেয়ের ভালবাসা সে পায় নি। তাই ওই শতদল নাকি নাম মেয়েটির—

কানু বললে—হ্যাঁ শতদল।

রোজা বললে, তা' ও যদি একটু আদর যত্ন করে, এই ধর্ খাবার সময় যদি কাছে গিয়ে বসে, দুটো মিষ্টি কথা বলে—হেসে হেসে কথা কয়—এই আর কী!

কানু জিজ্ঞেস করলো, ওকে জড়ি-বড়ি তুকতাক্ কিছু দিয়েছিস তুই?

রোজা বললে, সিঁদুর প'ড়ে দিয়েছি, নিজের কপালে পরবে।

কানু বললে, আচ্ছা, এরকম বশীকরণের ব্যবস্থা আমি ঠিক ক'রে দিতে পারবো।

রোজা বললে, তা যদি পারিস তো এই নে—পঁচিশটে টাকা।

কানু দেখলো, যথা লাভ! পঁচিশটা টাকাই হাত পেতে নিল সে। টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজে সে চ'লে যাচ্ছিল, রোজা জিজ্ঞেস করলো, মেয়েটাকে তুই কী ব'লে ডাকিস্ যেন—মাসিমা না কি!

যেতে যেতে কানু বললে, দূর ব্যাটা, মাসিমা কেন বলবো!—ভগিনী! ভগিনী!

হোটেলে ফিরে এসে কানু শতদলকে সব বুঝিয়ে ব'ললে। শতদলও এককথাতেই কানুর পরামর্শমতো বংশধরকে আদর-আপ্যায়ন ক'রতে রাজী হ'য়ে গেল। দু'চার দিন শতদলের সঙ্গে দেখা হ'লেই সেই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলো কানু।

দুপুরবেলা বিজয়ের ঘরের দিকেই যাচ্ছিল শতদল। ডেকে বললে, ভগিনী! ভগিনী! ঠিক যেমনটি বলেছি মনে থাকে যেন। শতদল হেসে বললে, খুব মনে আছে। তুমি যেখানে যাচ্ছ যাওতো।

নিজের ঘরে ব'সে মা-য়ের কাছে দু'ছত্র চিঠি লিখে কুশল সংবাদটা জানাচ্ছিল বিজয়।

শতদল আসতেই বিজয় তাকে বলে, কী সুরু করেছো তোমরা ওই ভদ্রলোককে নিয়ে?

শতদল বলে, আমাদের দোষটাই দেখলেন, আর উনি যে আমাদের সঙ্গে কী রকম করেন দেখতে পান না?

বিজয় কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই বংশধরবাবুর পাগ্‌লামির আসল কারণটা ধ'রে ফেলেছিল। সে তাই শতদলকে বুঝিয়ে বললে, ছাখো, তোমাদের ওই বংশধরবাবুকে আজকালের মধ্যে এখান থেকে সরাও, নইলে তোমরা মহা-বিপদে প'ড়ে যাবে। ওঁকে নিয়ে এরকম ক'রে ছেলে-খেলা আর কোরো না।

—কেন? কী হয়েছে? জিজ্ঞেস করে শতদল।

বিজয় বলে, যা' হ'য়েছে তা তুমি বুঝবে না। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি যদি অপারেশনের ব্যবস্থা না করো তো হুট্‌ ক'রে এইখানেই কোনদিন ম'রে যাবে তখন বুঝবে মজা।

হাসপাতাল, অপারেশন এসব শতদল কারুর চেয়ে কম বোঝে না। বিজয়কে ওস্তাদি করতে দেখে সে বললে, আমি না-হয় না বুঝবো, কিন্তু আপনি বুঝলেন কী ক'রে? আপনি ডাক্তার?

—হ্যাঁ, আমি ডাক্তার। বিজয় বললে।

—বললেই আমি বিশ্বাস করবো ?

বিজয় বললে, বিশ্বাস কর না কর, আমি বলছি আমি ডাক্তার।

শতদল হেসে বললে, ভাল। জানা রইল গ্রামের ডাক্তাররা শর্টহ্যাণ্ড শিখতে ক'লকাতায় আসে।

—শর্টহ্যাণ্ড তো শুধু তোমার জন্যে। বিজয় বললে।—তোমার খাতায় আমার নামটা ভুল ক'রে লিখে ফেললে ব'লে।

শতদলের হঠাৎ খেয়াল হয়, শুধু কলেজের খাতায় নয় নিজের মনের খাতাতেও হয়তো সে ভুল করেই বিজয়ের নামটা লিখে ফেলেছে। অন্য-মনস্কের মত সে বলে, সত্যি। আমার খাতায় আপনার নাম আমি ভুল ক'রেই লিখে ফেলেছি।

ধীরে ধীরে চ'লে যাবার জন্যে পা বাড়ায় শতদল। বিজয় বাধা দেয়, চ'লে যাচ্ছ কেন ?

উদাসদৃষ্টিতে ফিরে তাকায় শতদল : যাব না ?

বিজয় বলে, না। ব'লে যাও কী করবে ?

চিন্তিতভাবে শতদল বলে, দেখি চেষ্টা ক'রে—আপনার নামটা আমার খাতা থেকে কেটেই ফেলবো।

শতদলের কথা তলিয়ে বুঝবার দিকে তখন মন ছিল না বিজয়ের। সে বললে, নাম কাটার কথা বলি নি। বলছি—বংশধরবাবুর পেট কাটার কথা। তাড়াতাড়ি না কাটলে—

কথার মাঝখানেই শতদল বলে, তা আমি কী ক'রবো ?

—ওকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল। তোমার কথা উনি শুনবেন।

—না। আমি কিছু করতে পারবো না। শতদল মাথা নেড়ে বলে।

বিজয় বলে, তা'হলে আমাকেই সব ক'রতে হয়।

শতদল বলে, করুন। কিন্তু আমার মনে হয় হাসপাতালে যেতে উনি চাইবেন না সহজে।

—সহজে না যান, জোর ক'রে নিয়ে যেতে হবে।

বিজয় প্রতিজ্ঞা করে যে-ক'রেই হোক বংশধরের রোগযন্ত্রণা উপশমের ব্যবস্থা সে করাবেই।

জোরজবরদস্তি ক'রেই বিজয় বংশধরকে ভর্ত্তি ক'রে দিল হাসপাতালে। বংশধর তো কিছুতেই কেবিনে ঢুকবে না। সে চেঁচামেচি করতে লাগলো। আমি অপারেশান করাবো না বলছি তবু তুমি জোর ক'রে নিয়ে যাবে? বংশধরকে কোলপাঁজা ক'রে ধ'রে বিজয় বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, অপারেশন না করালে আপনি ম'রে যাবেন।

বংশধর বললে, মরি মরবো, তোমার কী?

পাশেই হাসপাতালের ডাক্তার দাঁড়িয়েছিল, সে বললে, মরতে আপনাকে আমরা দেবো কেন?

খিঁচিয়ে উঠলো বংশধর: উঁ—দয়ার সাগর, তুমি কে হে?

ডাক্তার বললে, আমি এই হাসপাতালের ডাক্তার। শুয়ে পড়ুন তো। বিজয়, ডাক্তার ও আরেকটা নার্স মিলে ধরাধরি ক'রে বংশধরকে টেবিলের ওপর শুইয়ে দিলে।

ডাক্তারকে বিজয় আগে থেকেই জানতো। একই বছরে ডাক্তারী পাশ ক'রেছে তারা। ডাক্তারকে বংশধরের ওপর একটু ভালোরকম নজর রাখতে ব'লে বিজয় নিশ্চিন্ত মনে ফিরে এলো বোর্ডিং-এ। যাহোক তবু ডাক্তারের কর্ত্তব্যটা সে করতে পেরেছে ব'লে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

এমন শিকারটা হাতছাড়া হ'য়ে গেল দেখে পাশের ঘরের শ্রীমান্ কানু তো মহাখাপ্পা! রোজই এসে সে শাসিয়ে যেতে লাগলো বিজয়কে। বিজয়ের তা'তে ভ্রূক্ষেপ-ই নেই। সে তখন নিজের চিন্তাতেই ব্যস্ত। এদিকে পটুপটি-

বাবু রোজ তাগিদ দিচ্ছিল ক্লাসে যাবার জন্যে। টাইপ শিখতে যে সে ক'লকাতায় আসে নি পট্‌পটিবাবু তা' জানবে কেমন ক'রে? যে-ব্যাপারের মীমাংসা করতে বিজয়কে পালিয়ে আসতে হ'য়েছিল তার কী হোল জানবার জন্যেই উদ্বিগ্ন হ'য়ে ছিল সে। অনেকদিন হোল মা-কে সে একখানা চিঠি দিয়েছে। এখনো তার কোন জবাব এলো না কেন সে ভেবেই পাচ্ছিল না।

ঘরে ব'সে ব'সে সে কথাই সে ভাবছিল। শতদল যে পা টিপে টিপে কখন তার কাছে এসে ব'সেছে তা সে টেরই পায় নি। হঠাৎ পট্‌পটিবাবুর ডাকে তার চমক ভাঙ্‌লো: শতদল! শতদল! বিজয়চৌধুরীর টেলিগ্রাফ।

দরজা দিয়ে টেলিগ্রামটা ঘরের ভেতর ছুঁড়ে দিয়ে গেল পট্‌পটি। শতদল সেটা কুড়িয়ে এনে বিজয়ের হাতে দিল: পড়ুন।

বিজয় পড়লো: Colliery subsiding. Apprehending danger. Come Sharp.

শতদলের দিকে চেয়ে সে বললে, আমার মা টেলিগ্রাম ক'রেছে।

কলিয়ারীর নাম শুনেই অবাক হ'য়ে গিয়েছিল শতদল। সে বললে, কলিয়ারী!

বিজয় বললে, হ্যাঁ, কলিয়ারী। রায়েদের কলিয়ারীর নীচে ধ্ব'সে যাচ্ছে।

কলিয়ারী!—মাটীর নীচে সুড়ঙ্গ ক'রে যেখান থেকে কয়লা তোলা হয়—সমস্ত সভ্য জগতের কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে যার ওপর—সেই কলিয়ারী ধ্ব'সে যাচ্ছে! ভারী আশ্চর্য্য লাগে শতদলের! আগ্রহের সঙ্গে সে ব'লে ওঠে, কলিয়ারী আমি কখনো দেখি নি। কিরকম বলুন তো?

বিজয় বলে, না দেখলে বুঝতে পারবে না।

কলিয়ারী দেখবার ঝোঁক চেপে যায় শতদলের। বিজয়ের কাছে

কচি খুকীর মত আব্দার ধরে, আমি কিন্তু যাব আপনার সঙ্গে। কলিয়ারী কখনো দেখি নি, দেখে আসবো।

বিজয় জিজ্ঞেস করে, দেবে যেতে ?

শতদল বলে, কে ?

বিজয় বলে, তোমার কাকা।

নিশ্চিতভাবে মাথা নেড়ে শতদল বলে, হ্যাঁ দেবে।

কথাটা বিশ্বাস হয় না বিজয়ের। সন্দেহ প্রকাশ ক'রে সে বলে, এত বড় আইবুড়ো মেয়ে, আমি কে কোথাকার, চেনা নেই পরিচয় নেই—

শতদল বাধা দিয়ে বলে, সে ভাবনা তো আপনার নয়। আমি যাব ব'লছি--আপনি নিয়ে যাবেন কিনা তাই বলুন।

শতদল বিজয়ের সঙ্গে যেতে চায়, মনে মনে এতে খুশিই হ'য়ে ওঠে বিজয়। সামনে পূজো আস্‌ছে, গ্রামের দুর্গোৎসব কত আনন্দের ব্যাপার। বাংলাদেশের নিঃস্ব-নির্জীব নিভৃত গ্রামগুলো যেন আনন্দময়ীর আগমনে নতুন প্রাণ পেয়ে বেঁচে ওঠে। পাঁচজনকে ডেকে দেখাবার মতই গ্রামের সেই সুন্দর রূপ। বিজয় শতদলকে জিজ্ঞেস করে, গ্রামের দুর্গোৎসব কখনো দেখেছ ?

শতদল বলে, গ্রামই দেখিনি তা দুর্গোৎসব! পূজোর তো আর দেরি নেই। আপনাদের গ্রামে দুর্গোৎসব হয় ?

—হয়। ব'লেই চুপ ক'রে যায় বিজয়। তার মনে পড়ে, অবস্থা খারাপ হওয়ার পর থেকে আগের মতন সেই মহা-সমারোহের দুর্গোৎসব বন্ধ হ'য়ে গেছে তার নিজের বাড়ীতে। রায়েদের বাড়ীতে প্রতিবৎসর যখন একসঙ্গে সাত-সাতটা ঢাক বেজে ওঠে, চৌধুরীবাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপের দিকে তখন আর চাওয়াই যায় না। নহবৎখানা, নাটমণ্ডপ সব কিছু যেন জনশূন্য শ্মশানপুরীর মতো খাঁ-খাঁ ক'রতে থাকে। দেশে যখন এবার যেতেই হবে, বিজয় মনে মনে সঙ্কল্প ক'রলো যেমন ক'রেই হোক এবার একবার দুর্গোৎসবের আয়োজন করবে সে।

জিনিষপত্র বাধাছাঁদা ক'রে পরের দিনই বিজয় দেশের দিকে যাত্রা ক'রলো। শতদলও কাকাকে বলে ক'য়ে চললো তার সঙ্গে। যাবার মুখে পট্‌পটিবাবুকে বিজয় নমস্কার ক'রতেই পট্‌পটিবাবু বললে, তাহ'লে সত্যিই যাচ্ছ? আবার এসো। শেখবার জন্যে এলে কিন্তু কিছুই শেখা হোল না।

শতদল জীবনে এই প্রথম তার কাকাবাবুর কাছছাড়া হ'তে চ'লেছে। কাকাবাবুকে সে আশ্বাস দিয়ে বললে, আমার জন্যে ভেবো না কাকাবাবু, আমি গিয়েই চিঠি লিখবো। তুমিও চিঠি লিখো।

শতদলকে বিদায় দিতে একটু বিচলিত হ'য়ে প'ড়েছিল পট্‌পটি। কথাটা বুঝতে না পেরে সে ভাবলো শতদল বোধহয় তাকে ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করতে বলছে। ঘাড় নেড়ে সে তাই বললে, হ্যাঁ, খাব-খাব। দিনে ভাত খাব, রাত্রে রুটি খাব।

দুঃখের ভেতরও না হেসে পারলো না শতদল। বিজয়কে বললে, ওঁর সঙ্গে আর বেশি ব'কে লাভ নেই।

দরজার বাইরে পা বাড়াতেই তারা দেখে, একটি লোক শতদলের খোঁজে এসেছে বংশধর চক্রবর্ত্তীর কাছ থেকে। বংশধরবাবুর মরণাপন্ন অসুখ। হাসপাতাল থেকে পালিয়ে দেশে চলে গেছে সে। তার শেষ ইচ্ছা, শতদল একবার তার সঙ্গে দেখা করে। লোকটির একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলো না বিজয়। সে ঠিক ক'রলো দেশে যাবার আগেই বংশধরবাবুকে একবার দেখে যাবে তারা।

মানকর ষ্টেশনে নেমে ন'ডিহা নারায়ণপুরে বংশধরের বাড়ীতে তারা তিনজনে এসে পৌঁছুলো। বংশধরবাবুর বাড়ীঘর, বিষয় সম্পত্তি এমন বিরাটধরণের যে তা দেখে অবাক হ'য়ে গেল বিজয়। এতবড়ো বড়লোক যে ঘরবাড়ী ছেড়ে কেমন ক'রে এতকাল একটা তৃতীয় শ্রেণীর বোর্ডিং-এ প'ড়ে থাকতে পারে, বিজয় তা কল্পনাও করতে পারে না। বাড়ীর ভেতরে

ঢুকতে ঢুকতে বিজয় সঙ্গের লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, এই বাড়ী বংশধরবাবুর ?

সঙ্গের লোকটি বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ—উনিই এখানকার জমিদার। তবে ওই যে বললুম রাস্তায়, মাথার একটু গোলমাল আছে।—এটা ছিল না, মানে এই এতটা ছিল না, হ'য়েছে ওঁর মেয়েটি মারা যাবার পর থেকে।

কথা বলতে বলতে তারা দোতলার বারান্দা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। সুমুখের একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন একজন ডাক্তার। ডাকলেন, নগেন !

বিজয়দের সঙ্গের লোকটির নামই নগেন। সে জিজ্ঞেস করলো, কী বলছেন, ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার শতদল ও বিজয়কে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এঁরাই বুঝি ?

নগেন বললে, হ্যাঁ, এঁরাই। এঁদেরই নিয়ে এলাম কলকাতা থেকে। তারপর শতদলকে দেখিয়ে ব'ললে, এরই নাম—শতদল।

শতদলের আসার অপেক্ষাতেই ছিলেন ডাক্তারবাবু। ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে তিনি বললেন, আসুন আপনারা, ভেতরে আসুন।

ঘরের ভেতর এক পাশে একখানা দামী খাট পাতা, তারই ওপর শুয়ে ছিল বংশধরবাবু। ডাক্তারের পিছু পিছু নগেন, শতদল ও বিজয় এসে ঘরে ঢুকলো। দূর থেকে বিজয়কে দেখেই চীৎকার ক'রে উঠলো বংশধর,—না না আমি যাব না, আমি যাব না, হাসপাতালে আমি কিছুতেই যাব না।

শতদল ইসারায় বিজয়কে স'রে যেতে ব'লে নিজে গিয়ে বংশধরের শিয়রের কাছে বসলো। সান্ত্বনা দিয়ে বললে, না না হাসপাতালে আপনাকে যেতে হবে না। আমি এসেছি আপনাকে দেখতে।

শতদলের কথায় আশ্বস্ত হোল বংশধর। খানিকক্ষণ একদৃষ্টিতে শতদলের মুখের দিকে চেয়ে থেকে সে বললে, তুমি এসেছ ? শতদল ? তুমি ?

শতদল ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ, আমি এসেছি।

বংশধর বললে, আমি কিন্তু চললাম! আর দেরি নেই।

শতদল বাধা দিয়ে বললে, ওকি কথা বলছেন?

একটু থেমে সে জিজ্ঞেস করলো, হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এলেন কেন?

বংশধর কোন জবাব দিল না। চোখ বুজে চুপ ক'রে প'ড়ে রইল সে। অনেকক্ষণ কোন সাড়াশব্দ নেই দেখে শতদল ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলো, এ কি হ'চ্ছে? এরকম করছেন কেন?

ডাক্তারও রোগীর অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। চিন্তিতভাবে তিনি বললেন, সকাল থেকে দেখছি—ঠিক এইরকম। মাঝে মাঝে জ্ঞান হ'চ্ছে, আবার মাঝে মাঝে বেহুঁস।

সবকথা ভালো ক'রে শুনবার জন্যে ডাক্তারবাবুকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল বিজয়।

বারান্দায় এসে বিজয় জিজ্ঞেস করলো, আপনি ডাক্তার?

বিজয়ের প্রশ্নে একটু বিব্রত হ'য়ে পড়লেন ডাক্তারবাবু। মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বললেন, ডাক্তার বলে আর লজ্জা দিচ্ছেন কেন? হোমিওপ্যাথী বই প'ড়ে কিছু ওষুধ নিয়ে ব'সেছিলাম এই গাঁয়ে, ওঁরই দয়ায় এখন ডাক্তার হ'য়ে গেছি। উনিই বাড়ীঘরদোর ক'রে দিলেন, বিয়ে দিয়ে দিলেন এই গ্রামে—কাজেই র'য়ে গেলাম।

—ওঁর কী হ'য়েছে বলতে পারেন? জিজ্ঞেস করলো বিজয়।

ডাক্তার বাবু বললেন, পেটের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। ওকি আজকের ব্যামো মশাই?

রোগের ইতিহাস বলতে সুরু করলেন ডাক্তারবাবু, পাঁচবছর ধ'রে সমানে ভুগছেন—উনি বলছেন, ভাইপোরা বাণ মারছে, আর আমি বই

প'ড়ে প'ড়ে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়াচ্ছি। কিছুই যখন করতে পারলাম না, মেয়েটা ম'রে যাবার পর থেকে মাথাটাও খারাপ হ'য়ে গেল, আমিই পাঠালাম কলকাতায় চিকিচ্ছের জন্য, ফিরে এসেই শুয়ে পড়লেন, বললেন—এক ব্যাটা ডাক্তারের পাল্লায় পড়েছিলাম,—হাসপাতালে ভর্ত্তি ক'রে দিয়েছিল - পালিয়ে এলুম।

বিজয় হেসে বললে, সেই ব্যাটা ডাক্তার আমিই।

—আপনি ?—আপনি ডাক্তার ?—অবাক হ'য়ে গেলেন ডাক্তারবাবু। ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলেন, আজ্ঞে কী হ'য়েছে ওঁর ?

বিজয় বললে, Billiary colic—ব্লাডারটা প'চে গেছে।

গোবেচারার মতো ডাক্তারবাবু বললেন, আজ্ঞে ওই দেখুন, ওসব কি আর আমরা জানি ?

ডাক্তারবাবুটি যে আন্দাজে ওষুধ দেওয়া ছাড়া শরীরতত্ত্বের কিছুই জানে না বিজয় তা অনেক আগেই বুঝেছিলে। সে বললে, আর কোনও আশা নেই। যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। এমনি করতে করতেই হার্ট ফেল করবে।

ডাক্তার উদ্বিগ্ন হ'য়ে বললেন, উনি কি তাহ'লে—

বিজয় বললে, আজ্ঞে হঁ্যা, আজকালের মধ্যেই মারা যাবেন।

বিজয়ের কথাটা বিশ্বাস হয় না ডাক্তারের। বংশধরের বাইরের অবস্থা দেখে সত্যিই কেউ ভাবতে পারে না যে এত শীগ্‌গির সে মারা যাবে। ডাক্তারবাবু তাই বিজয়কে বললেন, না না কী বলছেন আপনি! টন্‌টনে জ্ঞান রয়েছে—

বিজয় জোর দিয়ে বললে, ঠিকই বলছি। ওঁর আপনার লোকজন যদি কেউ থাকে তো ডাকুন।

ডাক্তার বললেন, আপনার ব'লতে তো ওই ভাইপো দু'জন, তাদের এ-ত্রিসীমানা মাড়াবার জো নেই।

বাইরে ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লছে বিজয় ভেতরে ততক্ষণে বংশধরের শেষ-অবস্থা। অনেকক্ষণ বাদে একবার জ্ঞান হোল তাঁর। মায়া! মায়া! ব'লে সে চেঁচিয়ে উঠলো।

কাকে ডাকছে বুঝলো না শতদল। শতদলের কানে কানে নগেন বললে, মেয়েকে ডাকছেন। যে মেয়ে ম'রে গেছে। অবিকল তোমার মতো দেখতে ছিল সে।

হঠাৎ যেন নগেনের কথায় ভুল ভাঙলো শতদলের। তার মনে হোল বংশধরকে ভুল বুঝে এতকাল কী অ-ন্যায়ই না ক'রে এসেছে তারা! লোকের বাইরের চালচলনটাই শুধু তারা দেখেছে আর বিদ্রূপ ক'রেছে, অন্তরের পরিচয় নেবার চেষ্টাও কখনো করে নি। মেয়ের মত সে এতকাল ভালোবেসেছে শতদলকে, শুধু শতদলের মুখ চেয়েই শত কষ্ট সহ্য ক'রেও সে বোর্ডিং-এ প'ড়ে ছিল এতকাল—এসব কথা ভেবে শতদলের মনে সত্যি সত্যিই আজ অনুতাপ হ'তে লাগলো।

কিন্তু অনুতাপ ক'রেই বা আর লাভ কী? নিজের যন্ত্রণাতেই আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে বংশধর। কিছু দেখবার শুনবার বা বুঝবার মতো মনের অবস্থা আর তার নেই। একবার শুধু চোখ মেলে চারিদিকে তাকালো সে। হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে বিছানার চারপাশে কী যেন খুঁজতে লাগলো।

নগেন বুঝলো, টাকার পুঁটলিটাই খুঁজছে বংশধর। সমস্ত টাকাকড়ি পুঁটলি বেঁধে এতদিন আগ্‌লে আগ্‌লে বেড়িয়েছে সে, বিশ্বাস ক'রে কার'ও হাতে তা ছেড়ে দিতে পারে নি! এখন এই মরণের মুখেও সেই পুঁটলিটা তার চাই। বংশধরের হাতে পুঁটলিটা এগিয়ে দিল নগেন: এই নিন, আপনার হাতের কাছেই তো র'য়েছে।

কাঁপতে কাঁপতে পুঁটলিটা হাতে নিল বংশধর। তারপর সেটা শতদলের হাতে দিয়ে বললে, এইটি তোমাকে দিলাম। তোমরা দু'জনে বিয়ে করো। তুমি আর—

আর বোধয় বিজয়ের নামটাই সে বলতে চেয়েছিল। কিন্তু মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। হঠাৎ দমবন্ধ হ'য়ে গেল তার, চোখের তারা স্থির হ'য়ে গেল, নিথর নিস্পন্দ পাথরের মূর্ত্তির মতন প'ড়ে রইল সে।

বিজয় বাবু! বিজয় বাবু! ব'লে চেঁচিয়ে উঠলো শতদল।

ডাক্তার ও বিজয় দুজনেই ছুটে এলো তাড়াতাড়ি। বংশধরের হাত, বুক দেখে বিজয় বললে, সব শেষ হ'য়ে গেছে।

শতদলের দু'চোখ বেয়ে তখন দর্ দর্ ক'রে জল গড়াচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে সে বললে, উনি কি আমাকে দেখবার জন্যেই এতক্ষণ বেঁচেছিলেন?

চোখ মুছতে মুছতে নগেন বলেন, আর ঐ পুঁটলিটি তোমাকে দেবার জন্যেই বোধ হয় আমাকে পাঠিয়েছিলেন।

কান্নাকাটী করা ছাড়া বংশধরের জন্যে এখন আর কিছু করবার নেই দেখে বিজয় ব'ললে, নিন, ভাইপোদের ডেকে আপনারা সৎকারের ব্যবস্থা করুন, আমরা চলি।

শতদলকে ডেকে সে বললে, ওঠো শতদল।

শতদল একটু কিন্তু ক'রে বললে, এই সময়ে এমনি ক'রে চ'লে যাওয়া কি আমাদের উচিত?

—হ্যাঁ, উচিত। বিজয় বললে, ওদিকে আমার মা যে পথ চেয়ে ব'সে আছেন।

বিজয়ের কথায় উঠতে হোল শতদলকে। পুঁটলিটী না নিয়েই চ'লে যাচ্ছিল সে। নগেন সেটী তুলে নিয়ে শতদলের হাতে পৌঁছে দিয়ে এলো।

ট্রেণের দেরী হ'য়ে যাচ্ছে দেখে আর দাঁড়ালো না বিজয়। শতদলকে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি রেলষ্টেশনের দিকে চ'ললো।

সবার আগে কমলই ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল অশ্বিনীকে: বাবা! বাবা! জামাইবাবু এলো।

অশ্বিনী তাদের কালিয়ারীর ম্যানেজারের সঙ্গে বৈষয়িক কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত ছিল। মুখ তুলে সে জিজ্ঞেস করলো, বিজয়? কোথায় এলো?

কমল বললে, ওদের বাড়ী গেল দেখলুম।

এ-খবরে বিশেষ উৎসাহ দেখালো না অশ্বিনী। কমলকে সে বললে, আচ্ছা যা তুই।

কমল চ'লে যেতে কলিয়ারী-ম্যানেজারের কাছে আবার সে দরকারী কথা পেড়ে ব'ললো, বলি—কলিয়ারী আপনার না আমার?

ম্যানেজার বললে, একী ছেলেমানুষি কথা বলছেন? আমি আপনার কলিয়ারীর ম্যানেজার, কলিয়ারীর ভালোমন্দ আমাকে দেখতে হবে তো!

—তা মন্দটা কী হোল যে আপনি চট্ ক'রে রিজাইন দিতে চাইছেন?

ম্যানেজার জবাব দিল, মন্দ কী হোল বুঝতে পারছেন না? কয়লার বাজার যেই গরম হোল অম্‌নি পিলারগুলো এলোপাথাড়ি উড়িয়ে দিয়ে মোটা টাকা অবশ্য লাভ করলেন সত্যি, কিন্তু এই যে আগুন লেগে এতটা জায়গা ধ্বংসে গেল, এ আগুন কি আপনি কখনো নেবাতে পারবেন?

অশ্বিনীর গোঁয়ার্ত্তুমি তবু যায়না: না পারি না পারবো, তাতে আপনার কী ক্ষতি শুনি?

ম্যানেজার ব'ললে, ক্ষতি আমার কিছুই নেই, কিন্তু মনে রাখবেন —তেরো নম্বর গ্যালারি আপনার এই বাড়ীর নীচেই। এরও ধ্বংসে যাওয়ার সম্ভাবনা একদিন আছে।

অশ্বিনী প্রতিবাদ করলো, আজ্ঞে না। তেরো নম্বর কাঁথি গেছে চৌধুরীদের বাড়ীর দিকে।

ম্যানেজার বললে, সেও তো আপনার জামাই-এর বাড়ী! আর তা'ছাড়া আইনতঃ ওদিকে তো আপনি যেতে পারেন না—ও আপনার সম্পত্তি নয়। তবু গেছেন খানিকটা, তাও আমি জানি। কিন্তু এটা ভুল বলছেন, আজ সকালে বিজবাবুর নায়েব সেই বুড়ো বনমালী এসেছিল

আমার কাছে, খুব ভাল ক'রে সার্ভে ম্যাপ দেখে ব'লে দিয়েছি—ওদিকটা একেবার Solid.

ম্যানেজারের কথা শুনে হাড় জ্ব'লে যায় অশ্বিনীর। কোথায় এই সুযোগে চৌধুরীদের খানিকটা ভয় খাইয়ে কাবু করা যেত, তা নয়, আগে থেকেই মাপজোক ক'রে তাদের নিশ্চিন্ত থাকবার ভরসা দিয়ে ব'সে আছে ম্যানেজার! ম্যানেজারকে বিদ্রূপ ক'রে উঠলো অশ্বিনী: খুব ভাল ক'রেছেন। মাথাটা একেবারে কিনেছেন আর-কী!

ম্যানেজারের কাছ থেকে ভালো ক'রে বুঝে সুঝে নিয়ে বনমালী এসে মহামায়াকে বললে, আমি নিজে দেখেছি, কলিয়ারীর ম্যানেজার কাগজপত্র দেখে আমাকে খুব ভাল ক'রে ব'লে দিয়েছে—আমাদের কোনও ভয় নেই, এদিকের মাটি কখনো বসবে না।

বিজয়ের জন্যে থালায় ক'রে মুড়ি আর শসা নিয়ে আস্‌ছিলেন মহামায়া। নিজের মনেই বললেন তিনি, কলিয়ারীতে যে আগুন লাগে তা তো বাবা কখনও জানতাম না।

বনমালী বললে, কলিয়ারীতে আগুন লাগে নি মা, আগুন লেগেছে আপনার বেয়াই অশ্বিনী রায়ের কপালে!

কথাটা ব'লে বনমালী চলে যাচ্ছিল। মুড়ির থালা নামিয়ে রেখে মহামায়া জিজ্ঞেস করলেন, বিজয় গেল কোথায়? বিজয়! আর সেই মেয়েটি-ই বা কী নাম যেন—হ্যাঁ, শতদল!

শতদলের নাম শুনে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়ালো বনমালী। বললে, মেয়েটিকে দেখেছিলুম খিড়কির পুকুরে চান করছিল। কিন্তু মা, ওই মেয়েটিকে দেখে এরই মধ্যে গাঁয়ের লোক সব বলাবলি করছে—বিজয় ওকে বিয়ে ক'রে এনেছে।

চান ক'রে গামছা দিয়ে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে ঘরে ঢুকছিল শতদল।

বিয়ের কথা শুনেই দরজার বাইরে থ'ম্‌কে দাঁড়ালো সে। ভেতরে তার সম্বন্ধে আর কী কথাবার্ত্তা হয় শুনবার জন্যে দরজার আড়ালে সে আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। মহামায়া বললেন, যার যা ইচ্ছে বলুক। আমি ভাবছি হাতেই পূজো। ষষ্ঠীর দিন বৌমাকে আনতে পাঠাবো, এবারেও যদি না পাঠায়, শতদলের সঙ্গেই বিয়ে দেব বিজয়ের।

বনমালী জিজ্ঞেস করলো, পূজো কি তাহ'লে সত্যিই হবে এ-বছর? —বিজয়ও বল্‌ছিল।

মহামায়া বললেন, বিজয়কে আমি বলেছি যে! ব'লেছি আমি স্বপ্ন দেখেছি—আবার ঠিক আগের মতই আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে পূজো হ'চ্ছে।

বনমালী ব'ললে, কিন্তু মা, বিজয় যে বললে চণ্ডীমণ্ডপে পূজো হবে না—আবার সেই কী যেন সরজামিন পূজো নাকি?

মহামায়া ব'ললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমাকেও বলছিল, সরজামিন নয়, সম্মাজানি পূজো।

শতদল আর বাইরে থাকতে পারল না কথাটা শুনে। ঘরে ঢুকে হাসতে হাসতে সে জিজ্ঞেস করলো, কী পূজো?

—চান হোল?—শতদলকে দেখে মহামায়া জিজ্ঞেস করলেন।

শতদল বলল, হ্যাঁ হোল। কী পূজো আর-একবার বলুন মা—

মহামায়ার মুখে ভুল কথাটা শুনতে খুব মজা লাগছিল শতদলের। মহামায়া বুঝলেন যে আসল কথাটা তিনি গুলিয়ে ফেলেছেন তবু তিনি আরেকবার বললেন—'সম্মাজানি পূজো'।

হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল শতদল। নায়েবমশাইকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি জানেন না? আপনি একবার বলুন।

বনমালী বললে—সরজামিন পূজো।

দু'জনেরই স্মরণশক্তি সমান দেখে শতদলের হাসি আর থামতেই চায় চায় না। এমন সময়ে ঘরে এসে ঢুকলো বিজয়: এত হাসি কিসের?

মহামায়া হেসে বললেন, ওই যে সেই তুই কী পূজো ব'লে গেলি—আমরা বলতে পারছি না, তাই হাসছে।

শতদল বললে, শুনুন না কী বলছেন। বলুন না মা আর-একবার!

মহামায়া বললেন, সম্মাজানি পূজো না-কি—

মায়ের কথা শুনে বিজয়ও না হেসে পারলো না। শতদল বললে, শুনুন—শুনুন, আরো আছে।

নায়েব-মশাইকে সে বললে, আপনি বলুন তো!

বনমালী বললে, সরজামিন পূজো।

বিজয় হাসি চেপে বললে, না-না, 'সম্মাজানিও' নয়, 'সরজামিনও' নয়—সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব। সার্ব্বজনীন—মানে সকলের।

এতক্ষণে তবু ব্যাপারটা কিছুটা পরিষ্কার হোল মা আর বনমালীর কাছে। মুড়ির থালাটা বিজয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে মহামায়া বললেন, মুড়ি খেতে চেয়েছিলি – খা।

বিজয় বললে, শতদল, তুমি খাও। এখানে ও ছাড়া আর কিছু পাবে না।

মা আর বনমালী চ'লে যেতেই মুড়ির থালা নিয়ে বসলো দুজনে। শতদল গল্প সুরু করলো, পূজোর সময় আপনার স্ত্রী-কে আনবেন না?

বিজয় বললে, না। ক'লকাতায় তুমি বিশ্বাস কর নি, এখন বিশ্বাস হ'লো তো আমার স্ত্রী আছে!

কোন জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে রইলো শতদল। বিজয় ঠাট্টা ক'রে বললে, এত কষ্ট করে এলে, সব বৃথা হ'য়ে গেল?

বিজয়ের কথাটা গায়ে লাগলো শতদলের। সে বললে আমি বুঝি এই জন্যেই এলাম এখানে? আপনার স্ত্রী আছে কিনা দেখতে!

ঠোঁট চেপে বিজয় বললে, তাইতো মনে হয়।

শতদল কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বললে, যান্!

অনেক দুরাশা নিয়ে বিজয়ের সঙ্গে গ্রামে এসেছিল শতদল। শুধু কলিয়ারী আর দুর্গোৎসব দেখাই নয়, বিজয়দের ঘর-সংসার দেখবে সে, বিজয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কটা আরো ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠবে, এমনি অনেক কল্পনাই সে মনে মনে ক'রে রেখেছিল। বিজয়ের স্ত্রী আছে শুনে তার মনটা একটু মুসড়ে পড়েছিল সত্যি, তবু সহজে মনের কথা বুঝতে দেবার মেয়ে সে নয়। বিজয়কে উল্টো চাপ দিয়ে সে বললে, আপনার মন, যা খুশী তাই ভাবতে পারেন আমার সম্বন্ধে, কিন্তু বাড়ীতে ডেকে এনে লজ্জা একটু কম দিলেই ভালো হোত না?

বিজয় কিছু ব'লবার আগেই শতদল বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দরজার সামনেই মহামায়ার সঙ্গে দেখা। তখনো মনের ভাবটা ঠিক সামলে নিতে পারে নি শতদল। জোর ক'রে মুখে হাসি টেনে সে বললে, জানেন মা! খুব ধুমধাম ক'রে পূজো হবে এ-বছর।

কী পূজো সেটা তখনো আয়ত্ত হয় নি মহামায়ার। তিনি কথাটা স্মরণ করবার চেষ্টা করছিলেন: সেই যে কী বলছিলে—সেই—

শতদল মনে করিয়ে দেয় তাড়াতাড়ি, হ্যাঁ, সার্ব্বজনীন—

মহামায়া বলেন, ও কী রকম পূজো, আমাকে একদিন বুঝিয়ে দিও তো মা!

শতদল হেসে বলে, বুঝিয়ে দিতে হবে না, স্বচক্ষে দেখবেন। শুধু এইটুকু এখন জেনে রাখুন, সার্ব্বজনীন মানে সকলের।

সত্যি সত্যি, সকলের জন্যেই এবার পূজোর আয়োজন করলো বিজয়। চণ্ডীমণ্ডপে নয়, বাড়ীর সামনে পোড়োজমিটা পরিষ্কার ক'রে সেখানে চালাঘর বেঁধে প্রতিমা বসানো হোল। গ্রামের কুলি-মজুর, মুচি-মেথর, সবাই যাদের ছোটলোক আর ছোটজাত বলে, তারা সবাই

পদ্মর মা বললে, ও কী অলক্ষুণে কথা ব'লছো মা, ছি!

চোখ ফেটে জল এলো বিমলার মার: ব'লবো না? পাঁচটা নয়, দশটা নয়, একটি মাত্র মেয়ে, স্বামী নিয়ে সংসার নিয়ে কোথায় সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর করবে তা নয়, বিয়ের পর থেকে কিরকম ঝক্‌মারি হ'চ্ছে বল্ দেখি! এবার যদি-ই বা বাপ রাজি হ'লো তো মেয়ে একেবারে বেঁকে বসলেন ধনুক ভাঙা পণ ক'রে—কিছুতেই যাবেন না।

মায়ের আক্ষেপ শুনে সামনের ঘর থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলো বিমলা। বিজয় এসেছে শুনে অবধি মনে মনে সে ছটফট্ করে মরছিল। নিজের মনের সঙ্গেই লড়াই চল্‌ছিল তার—কী ক'রবে সে? বিজয় যদি তাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে সে-ই বা বিজয়কে ছেড়ে থাকতে পারবে না কেন? রায়েদের বাড়ীর মেয়ে সে, স্বামী হ'লেই তার অবহেলা-অপমান মাথা পেতে নিতে হবে এমন শিক্ষা সে বাবার কাছে পায় নি। কিন্তু সব জেনে শুনে মা যে কোন্ প্রাণে তাকে সতীনের ঘর করতে ঠেলে পাঠাতে চায় তাই বিমলা বুঝতে পারছিল না। দুঃখে-রাগে মুখচোখ রাঙা ক'রে সে এসে মা-কে বললে, যেতে যে বলছ, সতীনের পায়ে তেল দিতে যাব—না সতীনের সেবা করবো গিয়ে? বল কী করতে হবে, আমি যাচ্ছি।

বিমলা শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে সতীনের ঘর ক'রবে বিমলার মা-ও তা চাইছিল না। বিজয়ের মতো ছেলে হুট্ ক'রে আবার বিয়ে করবে এটাই তাঁর ধারণার বাইরে ছিল। লোকের মুখে শোনা কথা, তাই সে বলছিল বিমলা নিজে একবার সেখানে গিয়ে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ঘুচিয়ে আসুক। সেই কথাই আবারও সে বিমলাকে বললে, বিজয় আবার বিয়ে করবে সেকথা যে আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। বিজয়কে আমি এই এতটুকু বয়েস থেকে জানি। তাই বলছি—নিজে গিয়ে একবার দেখে এলেই তো পারতিস।

—দেখে আসতে হবে না বিরক্তভাবে বিমলা বললে।—কমল!

কমলকেই এ-ব্যাপারে সাক্ষী মানলো বিমলা। কমল এসে জিজ্ঞেস করলো, কী ব'ল্‌ছো?

মায়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বিমলা ব'ললে, কী দেখেছিস্
কমল বল্‌লে, বা-রে! যখন এলো আমি তখনই দেখেছি—।
ধপ্‌ধপে গায়ের রঙ—ভারি সুন্দর মেয়ে—দিদির চেয়ে অনেক ভাল

ঠিক এই মুহূর্ত্তেই একটি নতুন মেয়ে এসে ঘরে ঢুকলো: না তুমি দ্যাখো নি—তোমার দিদির চেয়ে সুন্দরও নয়, ভালও নয়।

ঘরশুদ্ধ সবাই তাকে দেখে অবাক। বিমলার মা জিজ্ঞেস কর তুমিই কি—?

—হ্যাঁ মা, আমিই। ব'লে বিমলার মা'য়ের পায়ে হাতে দিয়ে করলো শতদল।—বিজয় বাবুর সঙ্গে আমিই এসেছি ক'লকাতা থেকে প্রথমেই শতদলের সিঁথির দিকে নজর পড়লো বিমলার মা'র। শত বুঝলো বিমলার মা কেন তার সিঁথির দিকে তাকাচ্ছে। শতদল সিঁথিতে সিঁদুর আছে কিনা দেখছেন? বিয়ে এখনও হয় নি।

বিমলার মা জিজ্ঞেস করলো, তাহ'লে এই যে শুনছি বিজয় বিয়ে ক'রে—

—ভুল শুনেছ মা। শতদল বললে।—আমি এসেছি গ্রাম পূজো দেখতে. আর এই,—বিমলার দিকে হাত দেখিয়ে সে বল একে দেখতে! এই আপনার মেয়ে তো?

বিমলার মা বললে, হ্যাঁ। ওই আমার মেয়ে বিমলা।

বিমলার হাত ধ'রে শতদল বললে, এসো ভাই একটু আড়ালে তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

পাশের ঘরে গিয়ে তারা ব'সলো দুজনে। হাসতে হাসতে শতদল বললে, ভয় পেয়েছিলে?

শতদলের এমন মিষ্টি ব্যবহার দেখে বিমলার রাগ-হিংসা অনেক আগেই জল হ'য়ে গিয়েছিল। সেও হেসে জবাব দিল, হ্যাঁ।

—এখন ভয় গেল তো? জিজ্ঞেস করলো শতদল।

কোন কথা না ব'লে বিমলা একটু হাসল শুধু। অভয় দিয়ে শতদল বললে, ভয় নেই, তোমার বিজয়বাবুটি বিয়ে কখনও করবে না।

বিমলা জিজ্ঞেস করলো, জানলে কেমন ক'রে?

শতদল ব'ললে, যদি বলি চেষ্টা ক'রেছিলাম—হেরে গেছি। বিজয়ের সঙ্গে শতদলের কোথায় কেমন ক'রে আলাপ-পরিচয় হোল সব কিছু আগাগোড়া জানবার কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারে না বিমলা। শতদলকে সে জিজ্ঞেস করলো, তোমাকে উনি পেলেন কেমন ক'রে?

—সেকথা তাকেই জিজ্ঞেস কোরো। মুচকি হেসে জবাব দিল শতদল। তারপর তার এ-বাড়ীতে আসার আসল উদ্দেশ্যটা সে খুলে বললে, আমি কিন্তু তোমাকে শুধু দেখতে আসি নি, নিতেও এসেছি, যাবে তো?

যেতে খুবই ইচ্ছে করছিল বিমলার। তবু শতদলের মুখ থেকে সমস্ত কথা আগে জেনে শুনে নেবার জন্যে সে বললে, আজ তুমি থাকো এইখানে; দুজনে গল্প করি, কাল যাব।

—আবার কাল কেন? শতদল তাগিদ দিয়ে বললে, আজই চল না, কতদিন দ্যাখো নি তাকে, দেখতে ইচ্ছে ক'রছে না?

ম্লান হেসে বিমলা বললে, ইচ্ছেটা কি একা আমারই?

শতদল বুঝলো ব্যথাটা কোথায়। তবু আজ পূজো-আর্চ্চার দিনে স্বামী-স্ত্রীর ভেতর একটা মন-কষাকষি থাকবে, তার নিজের কাছেই এটা বড় বিশ্রী লাগছিল। সে তাই বিমলাকে বুঝিয়ে ব'ললে, মিছি মিছি রাগ ক'রে কি হবে? তার চেয়ে দেখবে চলো কি রকম পূজো হ'চ্ছে

এবছর। যেখানে যতো গরীব-দুঃখী কুলি মজুর—মুখে যাদের কখনো হাসি দেখা যায় না, আজ তারাই ছাখো গিয়ে হেসে গেয়ে কিরকম আনন্দ করছে। এ-যেন তাদেরই উৎসব!

ব'লতে ব'লতে শতদলের নিজের মুখখানাই যেন আনন্দে ঝল্‌মল্ ক'রে ওঠে। গ্রামের ছোটবড় সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে আমোদ-আহ্লাদ ... এ ছবি যেন স্পষ্ট ভেসে ওঠে তার চোখের ওপর।

সত্যিই, এতবড় সার্ব্বজনীন উৎসব এর আগে গ্রামে আর কখনো হয়নি। সারা গ্রাম একেবারে মাতোয়ারা হ'য়ে উঠেছিল, লোকজনের প্রাণ-খোলা হাসিহল্লা, নাচ-গান আর ফূর্ত্তিতে। কুলি-লাইনে তো গান বাজনার শেষই ছিল না দিনরাত্রের ভেতর। খালি ঢোল বাজছে, মাদল বাজছে, আর তার সঙ্গে কান-ফাটানো গান চলেছে 'রামা হো, রামা হো'—। গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচও আছে তেম্‌নি। দৈত্যের মতো চেহারার কালো কুচ্‌কুচে একটা কয়লাকুলি একটা লিক্‌লিকে চেহারার মজুরণীর কোমর জড়িয়ে ধরে ধেই-ধেই ক'রে নাচ জুড়ে দিয়েছে। যতো লোক জ'মেছে সবাই খালি তালে তালে মাথা দোলাচ্ছে আর হাততালি দিয়ে বাহবা দিচ্ছে। হুল্লোড় যখন পুরোদমে চ'লছে এমন সময়ে হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর আওয়াজ হোল কড়-কড়-কড় কড়্ ক'রে। মনে হোল যেন একসঙ্গে একশোটা বজ্রপাত হোল গ্রামের চারিদিকে। আওয়াজটা একেবারে অজানা নয় কুলি মজুরদের। নাচ-গান বন্ধ হ'য়ে গেল, ভয়ে ভাবনায় দিশেহারা হ'য়ে পড়লো সবাই। চ'ক্ষের নিমিষে যে যেদিকে পারলো পাগলের মতো ছুটোছুটি সুরু ক'রে দিল।

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গ্রামের রূপ যেন বীভৎস হ'য়ে উঠ্‌তে লাগলো। আতঙ্কে আর্ত্তনাদে ছেয়ে গেল চতুর্দ্দিক। ছেলেরা কাঁদছে, মেয়েরা কাঁদছে, জোয়ান মরদেরা সবাইকে বাঁচাবার জন্যে মরিয়া হ'য়ে দৌড়োদৌড়ি করছে। দ্বিগুণ জোরে লিফ্‌টের চাকা ঘুরছে কলিয়ারীতে-কলিয়ারীতে। খাদের

নীচে যারা কাজ করছে, দেরী হ'লে আর তাদের কাউকেই বাঁচানো যাবে না। হুশ্-হুশ্ ক'রে ষ্টীম-ইঞ্জিনের পিষ্টন চলছে। প্রকৃতির সঙ্গে বিজ্ঞানের যেন আড়াআড়ি চলছে প্রাণপণে। বাঁধ ডিঙিয়ে, মাঠ পেরিয়ে লোকজন যে-যার বাড়ীর দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে। কিন্তু মানুষের সাধ্য কী যে দুর্ভাগ্যের সঙ্গে পাল্লা দেয়? পায়ের নীচের মাটি পর্য্যন্ত চড়্-চড়্ ক'রে দু'ভাগ হ'য়ে স'রে যায়, আর তার ভেতর থেকে গল্ গল্ ক'রে ধোঁয়া বেরোতে থাকে অনর্গল। লাফ ঝাঁপ দিয়ে কতকলোক সেই ফাটল পার হ'য়ে যায়, আর কতকলোক সেই অতল গহ্বরের ভেতরে প'ড়ে জীবন্ত-সমাধি লাভ করে।

কয়লার ধোঁয়া আর বিষাক্ত গ্যাসে আকাশ অন্ধকার হ'য়ে আসে। এ-দুর্য্যোগের মধ্যেও বারোয়ারী পূজামণ্ডপে উচ্চকণ্ঠে চণ্ডীপাঠ শোনা যায়: 'সর্ব্বমঙ্গলামঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে—।' দেবী দুর্গা যেন সত্যি সত্যিই এতক্ষণে অসুরনাশিনী, দনুজদলনী মূর্ত্তি ধারণ ক'রছেন। ধূপের ধোঁয়ায়, দীপের আলোয় তাঁর মুখের অট্টহাসিটী যেন আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে তাঁর ওষ্ঠাধরে। লোকজন ছুটতে ছুটতে এসে বিজয়কে খবর দিল, বাবু! বাবু! রায়েদের বাড়ী নেমে যাচ্ছে মাটীর নীচে।

—বাড়ীর লোকজন সব বেরিয়ে এসেছে? উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞেস করে বিজয়।

কিন্তু সে-কথা কেউই সঠিক ব'লতে পারে না। কালবিলম্ব না ক'রে দু'হাতে ভিড় ঠেলে যে-অবস্থাতে ছিল সেই অবস্থাতেই বিজয় ছুটে যায় রায়েদের বাড়ীর দিকে।

বিজয়কে বিপদের মুখে ছুটে যেতে দেখে মায়ের প্রাণ আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। তিনিও বিজয়ের পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে এগিয়ে যান কিছুদূর পর্য্যন্ত। চেঁচিয়ে সাবধান ক'রে দেন বিজয়কে, বিজয়! বিজয়! দেখিস্ যেন নিজে বিপদে পড়িস্ নি!

সবাই বার বার ক'রে বারণ করে বিজয়কে, আপনি যাবেন না, বাবু, যাবেন না।

কিন্তু কা'রো কথায় কর্ণপাত করে না বিজয়। দুর্জ্জয় সাহসে, দুর্ব্বার গতিতে একলাই সে এগিয়ে চলে বিপজ্জনক এলাকার দিকে।

ওদিকে রায়েদের চক্‌মেলানো তিনমহলা বাড়ী তখন ভিংশুদ্ধু নড়তে সুরু ক'রেছে থর্ থর্ ক'রে। ঝন্‌ঝন্ মড়-মড় শব্দ হচ্ছে চারদিকে। বাইরের গেট, নহবৎখানা, কাছারীবাড়ী একে একে সব ব'সে যাচ্ছে মাটীর তলায়। ভেতরের বাড়ীতেও ভীষণ এক-একটা ঝাঁকুনী লাগছে। জানলা দরজার কপাটগুলো ঠক্-ঠক্ ক'রে উঠ্‌ছে, বাসনপত্র ঝন্‌ঝন্ ক'রে প'ড়ে যাচ্ছে মাটীতে, দুম্ দাম ক'রে দেয়াল থেকে চুণবালির চাপ্‌ড়া আর ছাদের থেকে টালি-বরগা ভেঙে ভেঙে প'ড়ছে। একে সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে তার ওপর ধোঁয়ায়-গ্যাসে চারিদিক ঢাকা। ঘরে-চাতালে সিঁড়িতে-বারান্দায় সবাই সবাইকে ডাকাডাকি করে খুঁজে বেড়াচ্ছে। খালি হাউ-মাউ চীৎকার আর ছুটোছুটি হুটোপুটির ভেতর কে যে কোথায় যাবে, কী কর'বে কিছুই ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারছে না।

'মা'—'মা' বলে এঘর-সেঘর ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে বিমলা। অশ্বিনী ওদিকে বিমলাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে হন্ত-দন্ত হ'য়ে। ছেলে, মেয়ে, স্বামী কাউকে না দেখতে পেয়ে সারা বাড়ী তোল্‌পাড় ক'রে ফিরছে বিমলার মা। বারান্দা দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল কমল। মা তাকে থামালো, এই যে কমল! তোর বাবা কোথায়?

—বাবা আসছে। এখানে দাঁড়িয়ো না, পালিয়ে এসো।—মায়ের হাত ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে যায় কমল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই অশ্বিনীর ঘরের সেজবাতিটা ঝন্-ঝন্ শব্দে উল্টে প'ড়ে গেল টেবিলের ওপর থেকে। চক্ষের পলকে দাউ-দাউ ক'রে আগুন

জ্বলে উঠলো বিছানার চাদরে। সেই ঘর থেকেই বেরিয়ে আসছিল শতদল। বিমলাকে দেখতে পেয়ে সে বললে, এই যে! তোমাকেই খুঁজছি ভাই।

কান্নায় ভেঙে পড়লো বিমলা: একী হোল শতদল? এ-সময় তুমি কেন এলে এ-বাড়ীতে?

বিমলার হাত ধ'রে শতদল বললে, মরি তো একসঙ্গেই ম'রবো। চল, আর দাঁড়িয়ো না।

ছুটতে ছুটতে তারা নেমে যায় একতলায়। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে অশ্বিনী তখনো ডাকাডাকি করছে: বাবা! বাবা!—বিমলা! বিমলা!

বিমলা আর শতদল একতলায় এসে বাইরে যাবার পথই আর খুঁজে পায় না কিছুতে। যে-দরজা খুলতে যায় সেখানেই দেখে ধোঁয়া আর আগুনের হল্‌কা। একটা ঘরের ভেতর দিয়ে দৌড়ে যেতে যেতে একটা জ্বলন্ত কড়িকাঠ ভেঙে পড়লো তাদের দু'জনের মাঝখানে।

ওপাশ থেকে বিমলা ডাকতে লাগলো, শতদল! শতদল!

শতদল এদিকে থ'মকে দাঁড়িয়ে গেল একেবারে। সে শুনলো কে যেন ডাকতে ডাকতে আসছে: বিমলা! বিমলা!

ঘাড় ফিরিয়ে বিজয়কে দেখতে পেয়েই শতদল ছুটে গেল বিজয়ের দিকে: এসেছ? তুমি এসেছ?

বিজয় কিন্তু শতদলের দিকে ফিরেও চাইল না একবার। ঘরের পেছন দিক দিয়ে ঘুরে সে জলন্ত কড়িকাঠের ওপাশে গিয়ে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরলো বিমলাকে।

—তুমি! আবেগে-উত্তেজনায় গলার স্বর রুদ্ধ হ'য়ে গেল বিমলার।

বিজয় বললে, হ্যাঁ, আমি। কথা বলবার সময় নেই। এসো।

বিমলাকে দু'হাতে আড়কোলা ক'রে তুলে নিয়ে বিজয় বেরিয়ে গেল তাড়াতাড়ি। দূরে দাঁড়িয়ে শতদল শুধু কাঙালীর মতো চেয়ে রইল তা'দের দিকে। ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে চোখের জলে যেন বান ডাকলো তার।

বাইরে তখন প্রলয়কাণ্ড স্থরু হ'য়েছে। গাছপালা, বাড়ীঘর ভেঙে ভেঙে লুটিয়ে পড়ছে মাটীতে। ভীষণ জোরে দোল্‌ খেতে খেতে রায়েদের কলিয়ারীর হেড্‌-গীয়ারটা গোড়াশুদ্ধ উপড়ে নিয়ে ভেঙে পড়লো কুলিবস্তির ওপর। আওয়াজ শুনে পথ দিয়ে ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়ালো বিমলার মা। তার স্বামীর এত সাধের কলিয়ারী ধূলিসাৎ হ'চ্ছে দেখে বুক যেন তার ভেঙে যেতে লাগ্‌লো। কমল বললে, দাঁড়াচ্ছো কেন মা? চ'লে এসো।

মায়ের হাত ধ'রে টানতে লাগ্‌লো কমল। মা বললে, যাচ্ছি, কিন্তু তোর বাবা—

—বাবা ঠিক আসবে। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে কমলের। এই সর্ব্বনাশা জায়গা থেকে সে পালাতে পারলে বাঁচে। হঠাৎ বিমলাকে আসতে দেখে সে ব'লে উঠলো,—ওই তো দিদি!

বিমলাকে মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল বিজয়। শ্বাশুড়ীকে সে বললে, যান মা, আপনারা তাড়াতাড়ি পালান এখান থেকে। সোজা আমার বাড়ীর পাশে চলে যান—যেখানে পূজো হ'চ্ছে—

বিমলার মা ব্যস্ত হ'য়ে বললে, কিন্তু বিমলার বাবা—?

বিজয় বললে, আমি দেখছি। যান আপনারা।

বিজয় আবার ছুটে চললো বিমলাদের বাড়ীর দিকে। বিজয়কে একলা ছেড়ে দিতে আর ভরসা হ'চ্ছিল না বিমলার। পিছন পিছন তাকে আসতে দেখে ধমক দিয়ে উঠলো বিজয়, আঃ, তুমি আবার কেন?

শুকনো-মুখে বিমলা বললে, তুমি একা যাবে?

বিজয় ব'ললে. হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি একাই যাবো। তুমি চ'লে যাও কমলদের সঙ্গে।

তবুও বিমলা কথা শোনে না দেখে শ্বাশুড়ীকে ডেকে বিজয় বললে, একে এখান থেকে নিয়ে যান তো মা।

বিমলার মা ডাকতে লাগ্‌লো, আয় বিমলা, চ'লে আয়।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরতে হোল বিমলাকে। যতদূর পর্য্যন্ত বিজয়কে দেখা গেল সে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগলো তার দিকে। মা'কে বললে, শতদল যে আমার সঙ্গে আসছিল মা, সে আবার কোথায় গেল?

—তাইতো, কোথায় গেল সেই মেয়েটি? মায়ের মন হঠাৎ ছাঁৎ ক'রে উঠলো শতদলের জন্যে। তবু আর দেরি করা উচিত নয় ভেবে সে বললে, যাক গে, তুই আয়।

তিনজনে তারা এগিয়ে চললো বিজয়দের বাড়ীর দিকে।

চোখের জল মুছতে মুছতে শতদল তখন রেলষ্টেশনের পথ ধ'রেছে। গ্রাম দেখ্‌বার শখ তার মিটে গেছে একেবারে। আজকের এই বিপর্য্যয়ে শুধু যে রায়েদের বাড়ীই ধ্ব'সে যাচ্ছে তা নয়, শতদলের মনের স্বপ্ন-প্রাসাদও ভেংগে চুরমার হ'য়ে যাচ্ছে। বিজয়ের জীবনে যে আর তার কোনো জায়গাই নেই তা সে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছে এবার। বিজয় আর বিমলা সুখী হোক, বিরহ-বিচ্ছেদের শেষে হাসিমুখে আবার তারা ভালো-বাসার বাসা বাঁধুক, নিজের দুঃখ শতদল নিজের বুকেই বইবে চিরকাল, মনে মনে এই সঙ্কল্প নিয়েই নীরবে সে ফিরে যাচ্ছিল নিজের আশ্রয়ে। শেষ বিদায়ের আগে একবার গ্রামের দিকে আর একবার রেলষ্টেশনের দিকে তাকালো শতদল, বুঝবার চেষ্টা করলো দু'য়ের ভেতর কোনদিকে তার বেশি আকর্ষণ। দূরে সিগ্‌ন্যালের গোলাপী আলোটাই যেন হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকতে লাগ্‌লো বারে বারে। আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা

না ক'রে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই মিশিয়ে গেল শতদল।

বিজয়ের চোখের সামনে রায়েদের বিরাট বাড়ীটা তখন ধ্ব'সে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। অশ্বিনী তখনো বেরুতে পারে নি বাড়ী থেকে। প্রাণের চেয়েও টাকার সিন্দুকের ওপর তার বেশি মায়া। বাড়ীর থাম, খিলান, কড়ি, বরগা সবই যখন ভেঙে পড়ছে দুপ্ দাপ্ করে তখনও সে সিন্দুক থেকে টাকাগুলো বে'র করবার জন্যে ছুটেছে দোতলায়। নিজের ঘরে গিয়ে সিন্দুকের দিকে হাত বাড়াতেই সিন্দুক শুদ্ধ ঘরের কোণটা একেবারে ঝপাং ক'রে নেমে গেল নীচের দিকে। 'আমার টাকা—আমার টাকা' ব'লে অশ্বিনীও হুমড়ি খেয়ে পড়লো সেইখানে। তারপর বাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে কেমন ক'রে কোথায় যে সে তলিয়ে গেল নিজে তার কিছুই বুঝতে পারল না।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর বিজয় শুনতে পেল ইটকাঠের স্তূপের নীচে গর্ত্তের ভেতরে কে যেন 'বাবা! বাবা!' ব'লে কাৎরাচ্ছে। তখনো ধোঁয়া বেরুচ্ছে সে গর্ত্ত থেকে। বিজয় তবু অনেক কষ্টে নামলো সেই গর্ত্তের ভেতরে। নীচে গিয়ে দেখে একটা থাম চাপা প'ড়ে অশ্বিনী গোঙাচ্ছে। প্রাণপণ চেষ্টায় থামের একটা দিক একটু উঁচু করে ধরলো বিজয়। অশ্বিনীকে বললে, আমি থামটা তুলে ধরছি, আপনি বেরিয়ে যান ধীরে ধীরে। গলার আওয়াজ শুনে চোখ মেলে চাইল অশ্বিনী। বিজয়কে দেখে বললে, কে? তুমি বিজয়! আমাকে বাঁচাতে এসেছো? বিজয় বললে, হ্যাঁ। আপনি আস্তে আস্তে উঠুন ওখান থেকে। আমার হাত ধ'রে উঠে আসুন।

ঠেলে ঠেলে অশ্বিনীকে গর্ত্ত থেকে ওপরে তুলে দিল বিজয়। চেঁচিয়ে বললে, আপনি চ'লে যান, এ-মাটি আবার বসবে।

ওপরে উঠে অশ্বিনী সোজা হ'য়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু হাঁটু আর কোমরে এত ব্যথা যে দাঁড়াতে সে পারলো না কিছুতেই। শুয়ে শুয়ে সে হাত বাড়িয়ে দিল নীচে বিজয়ের দিকে। বললে, তোমাকে ছেড়ে চলে যাব?—ধরো—আমার হাতখানা চেপে ধরো। এখনো তোমাকে টেনে তুলবার মত গায়ের জোর আমার আছে।

বিজয় ওপরে উঠবার জন্যে চেষ্টা করছিল প্রাণপণে। কিন্তু গর্ত্তের ভেতর নামতে যা কষ্ট হ'য়েছিল, গর্ত্ত থেকে ওপরে ওঠা তার চেয়ে ঢের বেশি কষ্টকর। দেয়াল বেয়ে বেয়ে কিছুদূর যদি বা সে উঠে আসে, এক—আধটা আলগা ইঁটে হাত দিলেই টাল সামলাতে না পেরে পা ফসকে অনেকটা নীচে আবার তলিয়ে যায় সে।

'বিজয়! বিজয়!' ব'লে ডেকে ডেকে অশ্বিনী বিজয়ের আর সাড়াই পাচ্ছিল না। তবু সে সমানে ডেকে চ'লেছিল, বিজয়! বিজয়! কোথায় তুমি?

অনেকক্ষণ বাদে বিজয়ের সাড়া পাওয়া গেল নীচের থেকে: আপনি স'রে যান ওখান থেকে, পালিয়ে যান—আমি উঠছি।

অনেকক্ষণ হোল, বিজয় কিম্বা বাবা কেউই আসছে না দেখে বিমলা এদিকে অস্থির হ'য়ে উঠলো। মা-কে বললে, মা, আমি একবার দেখবো? বাবাকে সেই যে খুঁজতে গেল, কই এখনও তো এলো না।

মেয়েকে বাধা দেবার মতো মনের জোর আর মায়ের ছিল না। সে বললে, যাও, দেখে এসো গে।

বিমলা চ'লে যেতে কমলকে বুকে চেপে ধ'রলো মা! স্বামীকে ফেলে পালিয়ে আসতে তার মনেও কষ্ট হ'চ্ছিল ভয়ানক। দর্‌দর্‌ ক'রে দু'চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো তার।

বাড়ীর পথে দাদুর সঙ্গে দেখা হোল বিমলার। অক্ষত শরীরে বাড়ী থেকে বেরুতে পেরেছেন তিনি। বিমলাকে দেখে বড় রায় বললেন, এই যে দিদি, তোরা সব বেঁচে আছিস্‌ তো?

বিমলা ব্যস্তভাবে ব'ললে, বাবাকে যে খুঁজে পাচ্ছি না, দাদু!

বড় রায় বললেন আমিও তো তাকেই খুঁজছি দিদি। দেখি একবার ঐদিকটা ভালো ক'রে।

দাদু একদিকে বিমলা আর-এককিকে খুঁজে বেড়াতে লাগ্‌লো বাবাকে। বাবার চেয়ে বিজয়ের জন্যেও কিছু কম দুশ্চিন্তা ছিল না বিমলার।

বিজয় এদিকে অতিকষ্টে গর্ত্ত থেকে ওপরে উঠে এসেছে। টানাহেঁচড়ার চোটে কপাল কেটে গেছে তার, হাতে মুখে তার রক্ত আর কালিঝুলি মাখা। অশ্বিনীর অবস্থা আরো মারাত্মক। সারা শরীর তার কেটে-ছিঁড়ে তো গেছেই, সোজা হ'য়ে দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকুও আর নেই তার। বিজয় তার হাত ধ'রে দাঁড় করালো! বললে, আসুন আমার সঙ্গে।

বিজয়ের কাঁধে ভর দিয়ে অশ্বিনী বাড়ীর বাইরে পা বাড়াতেই দেখে বিমলা এসে হাজির।

বিজয় বিমলাকে বললে, বারণ করলুম, তবু তুমি কিজন্যে এলে বলো তো?

কোন জবাব দিল না বিমলা। মাথা নীচু ক'রে বিজয় আর অশ্বিনীর পিছু পিছু চ'ললো সে।

কমল তার মা-কে নিয়ে আগেই এসে পৌচেছিল বিজয়দের বাড়ীতে। বিমলা এসে বাড়ীর দরজায় পা দিতেই মহামায়া নিজে এগিয়ে এলেন তাকে ভেতরে নিয়ে যেতে। হাসিমুখে বললেন, এলে বৌমা! সেই তো আসতে হোল। স্বামীর ঘর ছাড়া মেয়েদের কি আর উপায় আছে মা?

তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন বিমলাকে, বিজয় কোথায়?

পূজামণ্ডপের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বিমলা: ওই তো!

মহামায়া দেখলেন, বিজয়ের কাঁধে ভর দিয়ে অশ্বিনী এসে পূজামণ্ডপের পাশে দাঁড়িয়েছে। নিশ্চিন্ত হ'য়ে বিমলাকে সঙ্গে ক'রে বাড়ীর ভেতরে চ'লে গেলেন মহামায়া।

পূজামণ্ডপে লোকজন গিস্ গিস্ করছে। সবাই তারা চেয়ে চেয়ে দেখছে অশ্বিনীরায়ের কী দুরবস্থা! যে চৌধুরীদের সঙ্গে একদিনের জন্যেও সদ্ভাব ছিল না তার, তাদেরই দরজায় আজ আশ্রয় নিতে আসতে হ'য়েছে তাকে। অশ্বিনী নিজেও সেজন্যে লজ্জিত হ'য়ে পড়েছিল। ধীরে ধীরে সে বিজয়কে বললে, আজ তোমারই কাঁধে ভর দিয়ে তোমারই দরজায় আমাকে আসতে হোল বিজয়!

—এমনিই হয়। বিজয় বললে। ধ্বংসের দেবতা কখন যে কেমন ক'রে মানুষের দর্পচূর্ণ করেন তা কেউ বলতে পারে না, একথা জীবনে বারবার টের পেয়েছে বিজয়।

অশ্বিনী জিজ্ঞেস করলো, আমাকে তুমি কেন বাঁচালে? তোমার স্ত্রী বিমলার বাবা আমি, সেইজন্যে?

বিজয় বললে, আজ্ঞে না। যারা দুর্গত, যারা দুঃস্থ তাদের দুঃখ-বেদনা দূর করাই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

পরের করুণার প্রত্যাশী হ'য়ে বেঁচে থাকতে হবে, তা ভাবতেও অশ্বস্তি লাগছিল অশ্বিনীর। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে ব'ললে, আমাকে তুমি না বাঁচালেই পারতে। আজ আমার মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু পর্য্যন্ত নেই।

বিজয় আশ্বাস দিল, আছে।

—আছে? বিস্ময়ের অবধি রইল না অশ্বিনীর।

বিজয় আবার জোরের সঙ্গে বললে, হ্যাঁ, আছে।

অশ্বিনী জিজ্ঞেস ক'রলো, কোথায়?

হাত বাড়িয়ে সামনের লোকজনদের দেখিয়ে দিয়ে বিজয় ব'ললে, এই এদের সঙ্গে।

সামনে দাঁড়িয়েছিল অশ্বিনীদেরই আশ্রিত কুলিমজুর, প্রজাখাতকের দল। সবাই তারা অবাক হ'য়ে গেল বিজয়ের কথা শুনে। এতবড় কলিয়ারীর মালিক, এমন নামজাদা জমিদার অশ্বিনীরায়—সেও কিনা শেষ-পর্য্যন্ত হাত মেলাবে এসে তাদেরই সঙ্গে। অশ্বিনীর অনুচর কার্ত্তিক তো ভীড়ের ভেতর থেকে হেসেই উঠলো হে-হে ক'রে।

তেজের আগুন নিভে গিয়েছিল অশ্বিনীর। ধমক দিতে গিয়ে সে আর ধমক দিতে পারলো না। নরম হ'য়ে বললে, হাসি হ'চ্ছে, কার্ত্তিক ?

কার্ত্তিক তাড়াতাড়ি সামলে নিল, আজ্ঞে না, হাসি নি তো। তারপর মিথ্যে ক'রে পাশের লোকটাকে সে ধমক দিয়ে বললে, এই ! হাসছিস কেন ? আজ আমাদের বাবুর দুঃখের দিনে হাসে ?

অশ্বিনীর দিকে চেয়ে বললে, এরা বলছে—ওই পিতিমে নিয়ে যাবে আপন্যাদের দুয়োর দিয়ে। তা আমি বলছি—যা দেখে আয় গে—বাবুদের সে-দুয়োর কি আর আছে ? বাড়ীশুদ্ধ তলিয়ে গেছে। আর বাবুদের পিত্তিমে ? আহা, মায়ের কী সুন্দর চেহারাই না হয়েছিল এবছর, তা মা-ও নজ্জায় হব্‌বব্‌ হব্‌বব্‌ ক'রে একেবারে পাতাল প্রবেশ করলেন।

কার্ত্তিকের কথা বলবার ঢঙ্ দেখে সবাই হেসে উঠলো হো-হো ক'রে। বিজয় ধমক দিল, এই কার্ত্তিক, কী হ'চ্ছে ?

নিজের দোষ ঢাকতে কার্ত্তিকও সবার দিকে মুখ খিঁচিয়ে বললে, আ, দাঁত বে'র ক'রে হাসছে দেখুন না ! নিমকহারামের দল যতো সব !

দুঃখের হাসি হেসে অশ্বিনী বললে, এই এদের কাছে আমাকে আশ্রয় নিতে বলছো বিজয় ?

বড় রায় এতক্ষণে পূজামণ্ডপে এসে পৌঁছেছিলেন। অশ্বিনীর কথা শুনে তিনি বললেন, না-না, আশ্রয় যদি নিতেই হয় অশ্বিনী, আয় আমার সঙ্গে।

অশ্বিনীর হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গিয়ে প্রতিমার পায়ের কাছে তিনি বসিয়ে দিলেন তাকে। বললেন, এইখানে বোস্ তুই। এর চেয়ে মানুষের নিরাপদ আশ্রয় আর কোথাও নেই।

বিজয় বড় রায়ের দিকে চেয়ে বললে, সেটা আপনার জন্যে হ'তে পারে কিন্তু ওঁর জন্যে নয়।

বড় রায় জিজ্ঞেস করলেন, কেন ?

বিজয় বললে, আপনার হয়তো বিশ্বাস আছে, কিন্তু যে অবিশ্বাসী তার কাছে ও প্রাণহীন মাটির পুতুল। তার চেয়ে এই যে অস্পৃশ্য মূর্খের দল— আপনাদের দুঃখদুর্দ্দশায় যাদের এতটুকু সহানুভূতি নেই—আজ যারা আপনার দুঃখে হে-হে ক'রে হাসতেও লজ্জা বোধ করে না—নেমে আসুন আপনার সিংহাসন থেকে—হাত বাড়িয়ে দিন ভাই ব'লে—ওরাই আপনাকে রক্ষা ক'রবে, প্রয়োজন হ'লে অকাতরে প্রাণ দিয়ে দেবে আপনাকে বাঁচাবার জন্যে।

বড় রায় জিজ্ঞাসা করেন, তাহ'লে এই প্রাণহীন মাটির প্রতিমাকে এখানে প্রতিষ্ঠা ক'রে ওদের এই উৎসবের আয়োজন তুমি কেন ক'রেছ, বিজয় ?

বিজয় বলে, এ শুধু উপলক্ষ্য মাত্র, ওদের সঙ্গে এক হ'য়ে দাঁড়াবার উপলক্ষ্য।—আপনারা এতকাল টাকার জোরে পৃথক হ'য়ে ছিলেন, আজ এই আকস্মিক বিপদ আপনাদেরও এইখানে টেনে এনে ওদের সঙ্গে এক ক'রে দিয়েছে।—ওই মাটির ঠাকুরের কাছে আশ্রয় নেবার ছল ক'রে বৃথা আর সময় নষ্ট ক'রবেন না,—আসুন, জীবন্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবেন আসুন।

—তুমিও একে মাটির ঠাকুর ব'লছো ? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন বড় রায়।

—অনেক দুঃখে ব'লছি। ব'লতে ব'লতে আবেগে কেঁপে ওঠে বিজয়ের গলা।—এইরকম ছত্রিশ কোটি দেবতার সেবক আমরা, ছত্রিশ

কোটি জাতের সৃষ্টি ক'রেছি। দেবতার নামে ধর্ম্মের ধ্বজা উড়িয়ে মানুষের ধর্ম্ম ভুলে গেছি, পশুর ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে শেষে জানোয়ারের মত খাওয়া-খাওয়ি মারামারি ক'রে আমাদের উন্নতির পথ—মুক্তির পথ পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রে দিয়ে বসে আছি।

এতবড়ো সত্য কথা এমন স্পষ্টভাবে এর আগে কখনো শোনেন নি প্রতাপ রায়। বিজয়ের ঐকান্তিকতা দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যান তিনি। বিজয়ের কাছে এগিয়ে এসে তিনি বলেন, বিজয়! বিজয়! তোমার মুখে এসব কথা তো আমি কোনোদিন শুনি নি। তুমি—তুমি কি চাও বিজয়?

মনের কথা ব'লতে বিজয়ের আর ভয় ছিল না কাউকে। তার মনে হ'চ্ছিল সে আজ দিগ্বিজয় ক'রে এসেছে, তার চিন্তা—তার সাধনা দিয়ে সকলকে অনুপ্রাণিত ক'রে তোলাই এখন তার কাজ। দৃপ্তকণ্ঠে দীপ্তচোখে সে ব'লতে লাগলো, আমি চাই—কিছুদিনের জন্যে অন্ততঃ আমাদের দেশ থেকে সমস্ত দেবতা অন্তর্হিত হোন্—একমাত্র দেবতা জেগে থাকুন শুধু আমার দেশ, আমার হিন্দুস্থান, আমার ভারতবর্ষ; আর এই দেশের মাটিতে যে-মানুষ জন্মগ্রহণ ক'রেছে সেই মনুষ্যজাতি! এই মানুষের কল্যাণ কামনায়—আর এই পরাধীন দেশের শত সহস্র লক্ষ কোটি মানুষের মুক্তি কামনায়, আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন আমার শেষ রক্তবিন্দুটি পর্য্যন্ত উৎসর্গ ক'রে দিতে পারি।

বিজয়ের কথায় উপস্থিত সকলেই যেন প্রাণের উন্মাদনায় চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো। বিজয় যে বিরাট কাজে আত্মোৎসর্গ ক'রেছে, অনুতপ্ত অশ্বিনীর ইচ্ছে হোল সে-ও এবার তা'রি সঙ্গে যোগ দেয়। সমস্ত গায়ের জোর একত্র ক'রে ঠেলে উঠলো সে মাটীর থেকে। বিজয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে ব'ললে, বিজয়! আমাকে তোমার সঙ্গে নাও!

বিজয়ও অশ্বিনীর হাত ধ'রে বললে, আসুন!

তারপর গরীব-দুঃখী, কুলিমজুরদের সে ডাক দিয়ে বললে, এসো

তোমরাও এসো। এইখানে এই জননী জন্মভূমির নামে এসো আমরা সবাই মিলে শপথ গ্রহণ করি—ভারতের মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক আমরা, পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হোক। বল, হয় স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু।—বন্দেমাতরম!

মিলিতকণ্ঠে সাড়া দিল সবাই: বন্দেমাতরম্!

পূজামণ্ডপের চূড়ায় ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয়-নিশান তখন শান্ত বাতাসে পত্‌পত্‌ ক'রে উড়ছে।

—সমাপ্ত—

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

পঞ্চাশের মন্বন্তর (৪র্থ সং) ২৲
রাষ্ট্র সংগ্রামের এক অধ্যায় ২৲

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

বৈদেশিকী (২য় সং) ৩৲

অতুলচন্দ্র গুপ্তের

সমাজ ও বিবাহ „ ১।•

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের

সমাজ ও সাহিত্য (২য় সং) ২।•

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

ভাবীকাল (২য় সং) ৩৲
কুড়িয়ে ছড়িয়ে ২৲
কুহকের দেশে ২।•

নীহার রঞ্জন গুপ্তের

অদৃশ্য শত্রু ১৸৹
শনি চক্র ১৸৹
রক্ত সংঘ ১৸৹
ড্রাগন ২৲

সরোজকুমার রায় চৌধুরীর

মহাকাল „ ৩॥•
১৩৫২-র সেরাগল্প ৪৲

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের

যৌবন জলতরঙ্গ ১॥•
কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ ১।•

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের

ভাগীরথী বহে ধীরে ২॥•

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বিষের ধোঁয়া (৩য় সং) ৩৲
পঞ্চভূত ১৸৹ লাল পাঞ্জা ১।•
গোপন কথা ২।• বুমেরাং ২।•

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

কাঠ-খড়-কেরোসিন ১৸৹
আসমান জমিন ২।•

প্রবোধকুমার সান্যালের

কলান্ত ২৲ স্বাগতম (৩য় সং) ২৲
পঙ্কতীর্থ (২য় সং) ২।•

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

তিমিরতীর্থ ২।•
বীতংস ২৲ দুঃশাসন ২৲
স্বর্ণসীতা ২।• সূর্যসারথী ৩৲

গ্রাংসিয়া দেলেদ্দার

মা (ঋষিদাস অনূদিত) ২।•

আজাদ হিন্দ গ্রন্থমালা

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের

দিল্লী চলো ২।•

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

মুক্তি পতাকা তলে ২।•

জ্যোতিপ্রসাদ বসুর

নেতাজী ও আজাদ
হিন্দ ফৌজ ২।•

শান্তিলাল রায়ের

আরাকান ফ্রন্টে ২৲

রাসবিহারী বসুর

বিপ্লবীর আহ্বান ১।•

নৃপেন্দ্রনাথ সিংহের

ভারত ছাড় ২।•

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর

জাপানী বন্দী-শিবিরে ২।•

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

ছদ্মবেশী ৩৲ রাজপথ ৪৲
আশাবরী ৩।• দিকশূল ৪।•
অমূল তরু (২য় সং) ৩৲

মনোজ বসুর

শত্রু পক্ষের মেয়ে ৩।•
দৈনিক (চর্থ সং) ৩।•
ভুলি নাই (৯ম সং) ২৲
ওগো বধূ সুন্দরী ২৸৹
একদা নিশীথকালে (৩য় সং) ২।•
নূতন প্রভাত (৩য় সং) ১৸৹
প্লাবন (২য় সং) ১।•
পৃথিবী কাদের (২য় সং) ১।•
বনমর্ম্মর (৩য় সং) ২।•
নরবাঁধ(৩য় সং) ২৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা ৫৲
হারাণ সুর (২য় সং) ৩৲
চৈতালী ঘূর্ণি (৪র্থ সং) ২৲
দ্বীপান্তর (২য় সং) ১।•

গোপাল ভৌমিকের

ভারতের মুক্তিসাধক (২য় সং) ২।•

মহেন্দ্রচন্দ্র রায়ের

পরম তৃষা ৪৲
ম্যাক্সিম গর্কী ৩।•

শৈল চক্রবর্ত্তীর

যাদের বিয়ে হ'ল (৩য় সং) ৩।•
কার্টুন ২৲ কৌতুক ১।•
যাদের বিয়ে হবে ৩৲

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের

কংগ্রেস-সংগঠনে বাংলা ১।•

ওয়েণ্ডেল উইল্কির

ওয়ান ওয়ার্ল্ড (২য় সং) ৩।•

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের

একাকিনী নায়িকা ২।•

প্রমথনাথ বিশীর

বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য ২৲
ডাকিনী ১।•
পরিহাস বিজল্পিতম্ ১।•

বনফুলের

বনফুলের গল্প (২য় সং) ২৲
নঞতৎপুরুষ ৩৲
ভূয়োদর্শন (২য় সং) ৩৲
আরও কয়েকটি ২৲

নবেন্দু ঘোষের

ডাক দিয়ে যাই (৩য় সং) ৩৲
এই সীমান্তে ২।• কালোরক্ত ২৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত

১৩৫১র সেরাগল্প ৩

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রতিবিম্ব ১।• চিন্তামণি ১৸৹
দিবারাত্রির কাব্য (২য় সং) ২৸৹